ভারত-সংস্কৃতি

রেখা-রূপ (আকর) গ্রন্থ

ভারত-সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

গুপ্ত-প্রকাশিকা
গুপ্তপাড়া, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা

॥ শ্রীঃ ॥

দেবভাষা সংস্কৃত ও মাতৃভাষা বাঙ্গালার

একনিষ্ঠ সেবক—

যাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল

বিভিন্ন ভাষাব শ্রেষ্ঠ অভিধানাবলীর প্রতিস্পর্ধী

বঙ্গীয় শব্দকোষ

(দশ বৎসব ধবিয়া খণ্ডশঃ প্রকাশের পবে যাহার সম্পূর্তি

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে একটী লক্ষণীয় ঘটনা),

সেই অক্লান্তকর্মা জ্ঞানতপস্বী ও কর্মী,

আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ব্রাহ্মণ,

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের কবকমলে

আন্তবিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

সমর্পিত হইল।

কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা,
বঙ্গাব্দ ১৩৫১। সংবৎ ২০০১ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা হইতে সংগ্রহ কবিয়া একত্র 'ভাবত-সংস্কৃতি' নামে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষেব সভ্যতা ও আদর্শের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও অনুভবী লেখকরূপে সুনীতি-বাবুব দৃষ্টি ও উপলব্ধি পরিচয় পাওয়া যাইবে, যে দৃষ্টি ও উপলব্ধি আধুনিক বঙ্গদেশে ও ভাবতবর্ষের শিক্ষিত জনগণেব নিকট সাধুবাদ অর্জন কবিয়াছে। আশা করি লেখকের পূর্ব-প্রকাশিত অনুরূপ প্রবন্ধ-সংগ্রহেব মত এই পুস্তকও পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে। ইতি।

কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১। শ্রীপ্রকাশক।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

এই লেখকের—

১। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ৪র্থ সংস্করণ (১৯৪২)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; মূল্য ২৲।

২। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)—মিত্র ও ঘোষ, মূল্য ২৲।

৩। পশ্চিমের যাত্রী (১৯৩৬), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ মূল্য ৩৲।

৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ৩য় সংস্করণ, মূল্য ২৲।

৫। দ্বীপময় ভারত (১৩৪৭), বুক কোম্পানি লিমিটেড, মূল্য ৪৲।

৬। চণ্ডীদাস-পদাবলী, প্রথম খণ্ড (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (বড়ুচণ্ডীদাসের পদ, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ, পরিশিষ্ট, দীনচণ্ডীদাসের পদ), মূল্য ২৲।

৭। বৈদেশিকী (বেঙ্গল পাবলিশর্স, ১৩৫০), মূল্য ২॥০।

৮। ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১), মূল্য ১৲।

৯। ইউরোপ-ভ্রমণ, ১৯৩৮ (মিত্র ও ঘোষ : যন্ত্রস্থ)।

ভারত-সংস্কৃতি

হিন্দু সভ্যতার পত্তন

আমাদেব হিন্দু সভ্যতাব অতি-প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমবা সকলেই অতিমাত্রায় সচেতন। প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ ভাবে চর্চা কবেন নি কিন্তু সাধাবণ শিক্ষা পেয়েছেন এমন হিন্দু-সন্তান প্রায় সকলেই এই কথাটীকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লে মেনে নিতে অভ্যস্ত যে, পৃথিবীতে সভ্যতাব প্রথম উদয় হয় আমাদেব এই ভাবতবর্ষে, আব এই প্রাচীনতম সভ্যতাব পত্তন ঘ'টেছিল আমাদেব আর্য্য পূর্ব-পুরুষদেবই মধ্যে। জগতে সভ্যতাব উদ্ভব আর্য্যদেবই মনীষাব ফল, এব জন্য কৃতিত্ব তাঁদেবই, আর তাঁদেব বংশধব ব'লে আমবাও এই কৃতিত্বেব উত্তবাধিকাবী। আমাদেব হিন্দুজাতিব অতি-প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সংস্কাব ছেলেবেলা থেকেই আমাদেব মজ্জাব ভিতরে পর্য্যন্ত গিযে পৌছায়। পুবাণ-কাহিনীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব, কলি—এই চার যুগেব কথা আমরা পড়ি, সে কত লক্ষ বছরের কথা। "লক্ষ"-টাকে না হয় একটু অতিরঞ্জন ব'লেই মানলুম, কিন্তু অনেক হাজাব বছরের কথা, এটা তো বটে।

আমাদেব মধ্যে যাঁবা আধুনিক শিক্ষা একটু-আধটু পেয়েছেন তাঁবা ভারতবর্ষেব বাইবেব কোনো এক দেশ থেকে বহু সহস্র বৎসব পূর্বে আর্য্যেরা যে এদেশে এসে হিন্দু সভ্যতার পত্তন কবেন, এ কথাটা সাধাবণতঃ এক রকম মেনেই নিয়েছেন। যাঁবা প্রাচীন শিক্ষা পেয়েছেন, কেবল সংস্কৃতই প'ড়েছেন, তাঁবা এ কথাটা নিয়ে মাথা ঘামাবাব আবশ্যকতাই উপলব্ধি

করেন না, বা স্বীকাব করেন না,—তাঁদের কাছে ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি, ভাবতের বাইরের কোনও দেশ থেকে কোনও কালে আর্য্যেরা যে এসে থাকৃতে পাবে, একথা মনে কবাই তাঁদের কাছে একটা অসম্ভব কল্পনা। ভাবতবর্ষেব বাইরে থেকে আর্য্যেবা এসেছিল কিনা, একথা নিয়ে আলোচনা এখন ক'ব্বো না, তবে ভাবতবর্ষেব বাইবে থেকেই যে আর্য্যেবা এসেছিল, এই মত-বাদই আমি গ্রহণ করি,—খালি এইটুকুই উপস্থিত ক্ষেত্রে ব'লে বাখ্‌ছি। বাইবে থেকে আর্য্যদেব ভাবতে আগমন হয়,—এই মত বিগত ঊনিশেব শতকেব মাঝামাঝি থেকে ইউবোপে কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিকেব মধ্যে দানা বাঁধ্‌তে থাকে, এবং পণ্ডিত মাক্স ম্যুলর্‌ এই মতটী বিশেষ ভাবে তাঁব প্রবন্ধাদিতে প্রচার কবেন। তিনি আব তাঁব মতন আবও কতকগুলি পণ্ডিত অনুমান ক'বেছিলেন যে, মধ্য-এশিয়ায়, এখন থেকে চাব হাজাব বৎসর পূর্বে, আদি আর্য্যজাতি বাস ক'বৃত, সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বা অন্য কাবণে আর্য্যদের বাস অসম্ভব হ'য়ে পড়ায়, তাবা পশ্চিমে আব দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে' পড়ে। তাদেব কয় দল ইউরোপে যায়, সেখানে রুষ, গ্রীস, ইতালী, জর্‌মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হয়, এই-সব দেশেব শ্লাব, গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন, কেল্‌ট্‌ জাতির লোকেবা এই প্রাচীন আর্য্যদেরই বংশধর। একদল মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আসে, তাবা পাবস্যদেশে উপনিবিষ্ট হয়, আবাব পাবস্য থেকেই তাদেব একদল আসে ভাবতবর্ষে, এরাই হ'চ্ছে বেদ-বচক ভারতীয় আর্য্য, এবাই ভাবতীয় সভ্যতাব মূল। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের অন্য-অন্য বিচার আব মতের সঙ্গে এই মতবাদটীও যথাকালে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌছাল, আব ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতীয়গণ বিশেষ প্রতিবাদ না ক'বে এই মতটী গ্রহণ ক'বলে। ইউবোপে ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয় জাতির লেখা-পড়া-জানা লোকেদেব মধ্যে এই

মতেব প্রতিষ্ঠা সহজেই হ'য়েছিল। সংস্কৃত, প্রাচীন ঈবানী, আর্মানী—এশিয়া-খণ্ডেব তিনটী সুসভ্য জাতিব এই তিনটী প্রাচীন ভাষা; আব ইউবোপেব প্রায় তাবৎ জাতিব ভাষা—গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন শ্লাব, আল্‌বানীয়, কেলটীয়, টিউটনীয়—এই সবগুলি, এক অধুনা-লুপ্ত মূল বা আদি আর্য্যভাষা থেকে উৎপন্ন,—তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা এই তথ্যটী নির্ধাবণ ক'বে দেয়, বিগত উনিশেব শতকের প্রথমার্ধে। এক "আদি আর্য্যভাষা" যদি মেনে নেওয়া গেল, তা হ'লে এই আদি আর্য্যভাষা ব'ল্‌ত এমন এক "আদি আর্য্যজাতি"কেও মান্‌তে হয়, আব ব'ল্‌তে হয় যে প্রাচীনকালে কোথাও-না-কোথাও এই জাতি বাস ক'ব্‌ত। যারা এখন বিভিন্ন আর্য্যভাষা বলে, আদি আর্য্যদেব সেই বংশধরেবা আজকাল পৃথিবীব মধ্যে সব চাইতে সভ্য জাতি ব'লে পবিগণিত, আব হিন্দু, পাবসীক, গ্রীক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন আর্য্যভাষী জাতিও সভ্যতায় খুব উঁচুতে ছিল। সুতবাং, আদি আর্য্যজাতিব লোকেবাও যে সুসভ্য ছিল, এরূপ অনুমান ক'ব্‌তে আধুনিক আর্য্যদেব বা আর্য্যম্মন্যদেব আট্‌কাল' না। এই "আর্য্যবাদ" ইউবোপীয় পণ্ডিতেবাই গ'ড়ে তুল্‌লেন। তাঁরা দেখ্‌লেন, ইউবোপেব আধুনিক আর্য্যভাষী জাতিব লোকেরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে' প'ড়েছে—পোর্তুগীস, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংবেজ, ফরাসী, জরমান প্রভৃতি জাতিব লোকেবা আফ্রিকা, এশিয়া, আমেবিকা, অস্ট্রেলিয়া, সর্বত্র ইউবোপেব সভ্যতা নিয়ে' গিয়েছে; সহজেই তারা ঐ-সব দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ক'বে নিয়ে', স্থানীয় "নেটিভ" জাতিদের উপর আধিপত্য ক'ব্‌ছে, তাদেব সুসভ্য ক'রে তুল্‌ছে (এটা অবশ্য ইউবোপীয় তরফেব কথা), এবং নিজেদেব অসুবিধা হ'লে বা দবকাব বোধ ক'র্‌লে তাদেব সমূলে উচ্ছেদ সাধনও ক'বেছে আর ক'ব্‌ছে। History repeats itsef—একই ইতিহাস বিভিন্ন কালে পুনরাবৃত্ত হয়,—এই অধ-সত্য বচন

কাজে লেগে গেল, এখন আর্য্যভাষীদেব দ্বাবায় যা হ'চ্ছে, প্রাচীনকালে আর্য্যদেব পূর্ব-পুরুষদেব হাতে তা-ই হ'য়েছিল, এরূপ অনুমান কবা হ'ল। আজকালকাব আর্য্যদেরই মত, সুসভ্য শ্বেতকায় সুন্দবকান্তি প্রাচীন আর্য্যেবা তাঁদেব পিতৃভূমি থেকে ছড়িয়ে' প'ড়ে, নানা অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য জাতিব দেশে গিযে, অবলীলাক্রমে তাদেব জয় ক'বে, সভ্যতাব আলোক দিয়ে তাদেব মানুষ ক'বে তোলে,—আর প্রাকৃতিক আব অন্য কাবণে গ্রীস, ইতালী, ভাবতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এবা নব-নব সভ্যতাব সৃষ্টি কবে। ভাবতবর্ষে এই ব্যাপাব বিশেষভাবে ঘ'টেছিল। এদেশে কৃষ্ণকায় অসভ্য জঙ্‌লী অনার্য্য বাস ক'র্‌ত, আর্য্যেবা এল', তাবা এদেব চেয়ে ঢেব বেশী উন্নত জাতি, তাবা যে অনার্য্যদেব জয় ক'বে তাদেব উপবে বাজা হ'য়ে ব'স্‌বে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপাব, এরূপটী তো হওয়াই উচিত, কতকগুলি অনার্য্য, আর্য্যদেব বশ্যতা স্বীকাব ক'বলে, তাবা আর্য্যদেব দাস হ'ল, আর্য্যদের সমাজে তাদেব স্থান দেওয়া হ'ল, তাদের নাম দেওয়া হ'ল "শূদ্র"। বাকী সব, হয় আর্য্যদেব হাতে ম'ল, নয় পাহাড়ে জঙ্গলে পালিযে' গেল—এদেবই বংশধব আজকালকাব কোল-ভীল-সাঁওতাল-মুণ্ডা, গোঁড-খন্দ-ওবাওঁ-মালেব, গাবো-বোডো-কুকি-নাগা। ভাবতবর্ষে বহু শত বৎসব পূর্বে যে-সব আর্য্য মানুষ এসেছিল, তাবা ইউরোপীয়দেব পূর্ব-পুরুষদেবই জ্ঞাতি, সুতরাং ভাবতের উচ্চবর্ণেব হিন্দু, যাবা নিজেদেব বিশুদ্ধ আর্য্য-বংশীয় ব'লে মনে ক'রে একটু গর্ব ক'বে থাকে, তারা হ'ল ইংবেজ আর অন্য ইউবোপীয়দেরই স্বগোত্রীয়—দূর সম্পর্কেব জ্ঞাতি। কথাটা ভাবতীয় উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে মন্দ লাগ্‌ল না (আব এই উচ্চবর্ণের হিন্দুবাই তো প্রথমটা ইংরেজী প'ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল)—বাজার জাতি ইংবেজ, তাঁদেব সঙ্গে এক গোষ্ঠীর, একথা উচ্চবর্ণের হিন্দুব মনেব নিভৃত কোণের মধ্যে একটু পুলকের ঝিলিক এনে দিয়েছিল ব'লেই মনে হয়,—তবে এ

মনোভাবটী বাইরে স্পষ্ট ক'রে স্বীকাব ক'রে জাতীয় আত্মসম্মান-বোধে আঘাত দিতে কেউ বাজী ছিলেন না। ইংবেজও এই সম্পর্ক এক রকম মেনে নিয়েই, ভারতেব ব্রাহ্মণ আব উচ্চবর্ণেব হিন্দুকে (আর তাদেব অনুগামী নিম্নশ্রেণীব হিন্দুকেও) our Aryan brother, the mild Hindu ব'লে পিঠ চাপ্ড়াতে লাগ্‌ল; ইংরেজেব তুচ্ছতাবোধ-মিশ্র এই উদাবতায় আমাদের অনেকে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেল।

নানা জাতিব সংমিশ্রণেব ফলে আমাদেব হিন্দুজাতি, এই সংমিশ্রণ প্রাচীনকালে অতি সহজেই অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ দ্বাবা ঘ'টেছিল। তাবপবে, তুর্কী-বিজয়েব পব থেকেই জাতিভেদেব কড়াকড়ি এসে গেল, পূবোপূবি মিশাল আব হ'য়ে উঠ্‌ল না। এব ফলে, হিন্দু জাতিব বিভিন্ন সমাজেব মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব'য়ে গেল, কোথাও বা আবার নোতুন ক'বে এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ গ'ড়ে উঠ্‌ল, বিভিন্ন শ্রেণীব মধ্যে একটী অবাধ অনুকম্পাব অভাব নোতুন ক'বে ঘ'ট্‌ল—এই অবাধ অনুকম্পার অভাবটুকুই আধুনিক হিন্দু-সমাজেব সব-চেয়ে বড়ো অভাব। এই স্বাতন্ত্র্য- বা পার্থক্য-বোধেব ফলে, নিজেবা আর্য্য-সন্তান ব'লে দাবী কবেন এমন উচ্চশ্রেণীব হিন্দুব মনে একটা আভিজাত্য-বোধও সুদৃঢ় হয়, তাতে ইউবোপ থেকে আমদানী-কবা অনার্য্য-জয়ী আর্য্যেব কল্পনা আবও সহায়তা কবে।

হিন্দু সভ্যতাব পত্তনেব ইতিহাসটী এইরূপে বেশ মনোমত ক'রে তৈরী হ'ল। কৃষ্ণকায় কুৎসিত-দর্শন অসভ্য বর্বব অনার্য্য জাতি, স্মরণাতীত যুগ থেকে এদেশে বাস ক'রত, তাদেব ধর্ম ছিল অতি নিম্ন স্তবেব, রীতি-নীতি ছিল ক্রূব। গৌরবর্ণ সুসভ্য আর্য্যেবা এসে তাদেব জয় ক'বলেন। আর্য্যদেব হাতেই হিন্দু সভ্যতার পত্তন হ'ল, প্রথম যুগেব আর্য্যদেব দেবতাদেব আবাধনা নিয়ে বেদ-সংহিতা, তাঁদেবই দেবতাদেব কথা নিয়ে পরের যুগে বচিত পুবাণ; আর্য্যদেব বাজবংশের ইতিকথা নিয়ে

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। অনার্য্যদের ধর্ম আর রীতি-নীতি একটা-আধটা গ্রাম্য অনুষ্ঠান বা আখ্যানের মধ্যে হয়তো কোথাও একটুখানি টিঁকে রইল, কিন্তু মোটের উপরে তার সমস্ত নিশানা আর্য্য সভ্যতার প্লাবনের মুখে ধুয়ে' মুছে' গেল।

অনার্য্যদের সম্বন্ধে এখন ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ আর্য্য-ভাষী উত্তর-ভারতে—যে একটা জুগুপ্সার ভাব এসে গিয়েছে, "অনার্য্য" শব্দটীই তার জন্য কতকটা দায়ী। "অনার্য্য" শব্দ যদি খালি "অন্-আর্য্য" অর্থাৎ 'যা আর্য্য নয়, বা আর্য্যজাতি-সম্পৃক্ত নয়' এই অর্থেই প্রযুক্ত হ'ত, তা হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু "অনার্য্য" অর্থে 'ঘৃণ্য, নীচ', এই অর্থ সংস্কৃত-যুগ থেকেই এসে যাওয়ায়, শব্দটী জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে, মানসিক ও নৈতিক অপকর্ষ-বাচক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেশময় সব জাতিই আর্য্যত্বের দাবী উপস্থিত ক'রছেন—তাঁরা দ্বিজ—হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য, তাঁরা অনার্য্য শূদ্র নন। এটী আর কিছুই নয়, আধুনিক জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটী প্রতিক্রিয়া মাত্র। সকলেই দ্বিজ হোন্, "আর্য্য" হোন্ অর্থাৎ noble হোন্, নিজেদের উচ্চ মনে ক'রে যথার্থ উচ্চ হ'য়ে থা'কবার শক্তি লাভ করুন—আর্য্যানার্য্য সকলেরই জন্য আমি এ কামনা করি।

আর্য্যদের শ্রেষ্ঠতার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করাই আজকাল heresy বা পাষণ্ডোচিত মনোভাব-প্রসূত ব'লে অনেকে গণ্য ক'রবেন। আর্য্যেরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতি ছিলেন না—এ কথা বলা, বা এ কথার ইঙ্গিত করা, যেন পিতৃপুরুষের নিন্দা করার মতন অথবা স্বজাতিদ্রোহিতারূপ মহাপাতক, এই রকমের একটী আবছা-আবছা ধারণা অনেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে এখনও আছে। তবে হিন্দুর মনে সত্যানুসন্ধিৎসা সদা-জাগ্রত। তিনটী মনোভাবকে আমি আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির মূল মনোভাব ব'লে

মনে করি—সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা, আর অহিংসা; সত্যানুসন্ধিৎসাই আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসে যা কিছু আধ্যাত্মিক আর আধিমানসিক উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, এখনও এই সত্যানুসন্ধিৎসা আমাদের একেবারে যায় নি। সুতরাং, এ-সব কথা শিক্ষিত হিন্দুর কাছে ব'ললে, প্রথমটা প্রচলিত সংস্কারে একটা আঘাত লাগ্‌লেও, জিনিসটাকে সাধারণ হিন্দু তলিয়ে' বুঝ্‌তে চায়—নোতুন আর সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত মত ব'লে শেষ শেষ পর্য্যন্ত মুখ ফিরিয়ে' ব'সে থাক্‌তে চায় না, বা পারে না।

ভারতবর্ষে আর্য্যদের একাধিপত্যের স্বপক্ষে প্রবলতম যুক্তি হ'চ্ছে আর্য্যভাষা সংস্কৃতের স্থান,—সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র এই আর্য্যভাষা সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ হ'য়ে থাকা রূপ ব্যাপারটা, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর-ভারতে আর্য্যভাষার প্রসার। সংস্কৃত শাস্ত্রের—বেদের না হোক্ পুরাণের—মত অনুসারে আবার আমাদের ইতিহাস অনাদিকাল থেকে ধারাবাহিক রূপে চ'লে এসেছে—অন্ততঃ, অতি প্রাচীনকাল থেকে। এই ভাষাগত ও সাহিত্যগত যুক্তি দুইটী সবচেয়ে বেশী ক'রে আমাদের 'আর্য্য-বাদ'-গ্রস্ত ক'রে রেখেছে।

এর প্রতিপক্ষে কয়টী যুক্তি আছে, সে কয়টী এই—দাক্ষিণাত্যে আর দক্ষিণ-ভারতে সুসভ্য অনার্য্য ভাষার অস্তিত্ব, সংস্কৃত-সমেত উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান অনার্য্য ভাষার প্রভাব; খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেকার যুগের আর্য্যভাষী হিন্দুর সভ্যতার নিদর্শনের একান্ত অভাব; ভারতের বাইরে আর্য্যজাতির ইতিহাস, জগতের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের সংযোগ।

তমিল ভাষা তার বিরাট্ সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ-ভারতে বিদ্যমান,—এই ভাষা দ্রাবিড়দের স্বতন্ত্র সভ্যতার এক অনপনেয় নিদর্শন, যে সভ্যতা পুরাপুরি আর্য্যসভ্যতার কাছে আত্ম-বলিদান দেয় নি। বৈদিক ভাষা

ভারতের আর্য্যভাষাব প্রাচীনতম নিদর্শন—এই ভাষাতে প্রাচীন আর্য্য-ভাব অনেকটা বিদ্যমান , কিন্তু এই বৈদিক ভাষাতেও অনার্য্য ভাষার ছাপ কিছু পবিমাণে আছে , আর তা ছাড়া যতই এদিকে আসি, ততই অনার্য্য ভাষাব প্রভাব আর্য্য ভাষায় (অর্থাৎ অর্বাচীন সংস্কৃতে আব প্রাকৃতে) বাড়ছে, দেখতে পাই ; আর্য্যভাষাকে যে ক্রমে-ক্রমে আনার্য্য ভাষাব, কোল-দ্রাবিড়েব ছাঁচে ঢেলে নেওযা হ'য়েছে, আর্য্য ভাষা ক্রমে যে অনার্য্যেবই ঘবে জা'ত দিয়ে ব'সছে—তা বুঝতে দেবী হয় না। এ ছাড়া, রামায়ণ, মহাভাবতেব আব পুবাণের মধ্যে বড়ো-বড়ো বাজা-বাজড়াব নাম আমরা পাই , কিন্তু আমাদেব অনুমিত বামায়ণ, মহাভাবত আব পুবাণেব যুগেব, অর্থাৎ তিন-চাব-পাঁচ হাজাব বছব পূর্বেকাব হিন্দু যুগেব, পুবাতন ঘব-বাড়ী, হাতের কাজ, শিল্পেব নিদর্শন—এ-সব কিছুই তো পাই না , মাত্র হাজাব দুই বছরেব প্রাচীন এই "ইতিহাস" অর্থাৎ মহাকাব্য আব পুবাণ গ্রন্থগুলিই আমাদেব প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাব ইতিহাসেব একমাত্র অবলম্বন , —এই সাহিত্যিক অবলম্বন ভিন্ন, "পাথুবে' প্রমাণ" কিছুই নেই। মৌর্য্য যুগেব আগেকাব হিন্দু সভ্যতাব নিদর্শন তা হ'লে কিছুই কি নেই ? মিসব, বাবিলোন, আসিবিয়া, এশিয়া-মাইনব, ক্রীট-দ্বীপ—এ-সব জায়গায় তো এখন থেকে তিন-চাব-পাঁচ হাজাব বছবেবও জিনিস পাওয়া গিয়েছে , ভাবতবর্ষে মোহন-জো দড়ো আর হড়প্পায় যে-সব নগবেব ধ্বংসাবশেষ আব অন্য জিনিস মিলেছে, সেগুলি অবশ্য ৪।৫ হাজাব বছব-পূর্বেকাব, কিন্তু সেগুলি তো আর্য্য জাতির লোকেদেব হাতের কাজ নয়—অন্তত: ঐ বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন এমন পণ্ডিতেবা এই কথাই ব'লছেন। এর উপব আছে—ভাবতের বাইরে আর্য্যজাতিব ইতিহাসেব কথা। আর্য্যেবা তাদের আদি বাস-ভূমি থেকে ইতিহাসেব ক্ষেত্রে (অর্থাৎ অন্য পাঁচটী জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে বা মিলনে) কখন প্রথম দেখা দিলে, তাবও একটী হদিস পাওয়া

যা'চ্ছে,—সেটা এখন থেকে মাত্র চার হাজার বছর পূর্বে; তখন গ্রীসে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে তাদের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়, এর ঢের পরে তারা ভারতবর্ষে আসে—ভারতবর্ষ থেকে যে তারা বাইরে গিয়েছিল, এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে বড়ো একটা যুক্তি নেই। শেষ কথা—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অন্য দেশের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌লে চ'ল্‌বে না। প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষ পারস্য-বাবিলোন ও এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিল, সে যোগসূত্র আমাদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নির্ধারণের একটা প্রধান অবলম্বন। সেটীকে বাদ দেওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। গ্রীস প্রভৃতি অন্যান্য নানা দেশে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি আর বিভিন্ন জাতির লোকের মিশ্রণে, কি ভাবে নবীন এক-একটী জাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল,—আমাদের হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি আলোচনার কালে সেদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রা'খ্‌তে হবে।

কি ভাবে হিন্দু সভ্যতার পত্তন ঘ'টেছিল, আর পূর্ণরূপ-প্রাপ্ত হিন্দু-সভ্যতার বয়সই বা কত, এ সম্বন্ধে যে মতবাদ আমার মনে হয় একটু-একটু ক'রে সাধারণ্যে গৃহীত হ'য়েছে আর হ'চ্ছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই মতবাদের কিছু দিগ্‌দর্শন করবার চেষ্টা ক'র্‌বো। বিষয়টা a posteriori হিসাবে অর্থাৎ জ্ঞাত তথ্যের আধারের উপর অনুমান ক'রে না ব'লে, a priori অর্থাৎ ইতিহাসাত্মক ক'রে, পৌর্বাপর্য্য অনুসারে পুনর্গঠিত রূপের বর্ণনা ক'রে, ব'লে যাবো। পরে ভবিষ্যতে এক-একটী বিষয় অবলম্বন ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৩০০০-এর দিকে, মধ্য-বা পূর্ব-ইউরোপের কোনও অংশে, অথবা রুষ দেশে উরাল-পর্বতমালার দক্ষিণের সমতল ভূভাগে, আদি Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যজাতির উৎপত্তি হয়। নিজেদের দেশে সভ্যতায় এবং

খুব উচ্চ স্তরে উঠ্‌তে পারে নি—বাস্তব সভ্যতায় এরা অনেকটা পেছিয়েই ছিল। তবে এদের মধ্যে অনেক মানসিক আর নৈতিক গুণের উদ্ভব হয়; এরা একাধারে কর্ম্মী ও চিন্তাশীল, কল্পনাশীল ও দৃঢ়ব্রত জাতি ছিল, নিজেদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার ভাবও যথেষ্ট ছিল, আর, অনুমান হয়, এদের মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যে কতগুলি ধারণা ছিল, সেগুলির আধারের উপরই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য মনোভাব প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যজাতির মধ্যে বহু গোত্র ছিল, আর এই-সব গোত্রের মধ্যে এদের মূল-ভাষারও কিছু-কিছু পার্থক্য এসে যায়। এই আদি আর্য্য জাতি কোনও কারণে তাদের পিতৃভূমি থেকে পূবে, দক্ষিণে আর পশ্চিমে ছড়িয়ে' প'ড়তে বাধ্য হয়। দেশে শীতের হঠাৎ আতিশয্য এর একটী কারণ হ'তে পারে; আবার পূর্ব আর উত্তর থেকে অনার্য্য উরাল-আল্‌তাই জাতীয় লোকেদের চাপ বা আক্রমণও একটী প্রধান কারণ হ'তে পারে।

আর্য্যেরা যখন ৩০০০ খ্রীঃ-পূঃ-তে তাদের নিজেদের দেশে আদিম অবস্থায় আছে,—কিছু চাষবাস, কিছু মেষ-চারণ, এই তাদের প্রধান বৃত্তি—তখন কিন্তু জগতের অন্যত্র কতকগুলি বড়ো-বড়ো সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে; প্রথম—মিসরের সভ্যতা, খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ থেকে যার জের টান্‌তে হয়, আর যার মূল পত্তন আরও প্রাচীন, বাবিলোন আর আসিরিয়ার সভ্যতা,—প্রায় মিশরের মতই প্রাচীন, আর এ ছাড়া, এশিয়া-মাইনর আর আর্য্য-পূর্ব গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বড়ো-বড়ো ইমারত, দেবমন্দির, ভাস্কর্য্য, মূর্তিশিল্প, শিলালেখ, মৃণ্ময়লেখ, আর যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয়বার্তা, প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে এই সভ্যতা, আদি আর্য্যদের এসব কিছুই ছিল না। মিসর ও মেসোপোতামিয়ার লোকেরা গাধা ও গোরুকে প্রথম পোষ মানায়, আর অনেকে অনুমান করেন, গো-পালন মেসোপোতামিয়া থেকে উত্তরে আদিম-আর্য্যদের মধ্যে প্রসৃত হয়—গোরুর জন্য আদিম

আর্য্য শব্দটী, সংস্কৃত "গৌ, গো" যা থেকে হ'য়েছে, সেটী মূলে মেসোপোতামিয়ার সুমের-জাতির ভাষার শব্দ। এরা কিন্তু প্রথমে ঘোড়ার কথা জানত না। ঘোড়া রুষ-দেশের বন্য পশু ছিল। আর্য্যেরা আগেই ঘোড়ার সংস্পর্শে আসে, আর এই ভাবে তারা নিজেদের দেশে থাকৃতে-থাকৃতে একটী বড়ো অস্ত্র সংগ্রহ করে—তারা ঘোড়াকে পোষ মানায়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে বা দুই ঘোড়ায় টানা দু'চাকার রথে চ'ড়ে, তারা দূরপথ অল্পদিনে অতিক্রম করবার একটা উপায় আবিষ্কার ক'রলে। এই আবিষ্কারের ফলে, যখন তারা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম এসে অবতীর্ণ হ'ল, তখন সুসংবদ্ধ, আত্মবোধ-যুক্ত, কর্মশক্তি ও ভাবনাশক্তিতে বলীয়ান্ এই আর্য্যদের—এরা পার্থিব সভ্যতায় অর্দ্ধ-বর্বর হ'লেও—এদের রোধ করা সুসভ্য মিসর, আসিরীয়-বাবিল, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের অধিবাসীদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়া'ল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২০০০-এর দিকে এই আর্য্যজাতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পিতৃভূমির বাইরে অন্য জাতির দেশে প্রথম দেখা দিলে। এদের আগমনের সংবাদ আমরা প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন এশিয়া-মাইনরে ও আসিরিয়া-বাবিলোনিয়াতে পাই। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল জানি না; খুব সম্ভব তখন দ্রাবিড়-জাতীয় আর বা Austric অস্ট্রিক কোল জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতে গঙ্গা আর সিন্ধু প্লাবিত দেশে, আর দক্ষিণ-ভারতে, তাদের সভ্যতা কায়েম ক'রে শান্তভাবে জীবন যাপন ক'রছে। আর্য্যেরা নিজ পিতৃ-ভূমিতে ইতিমধ্যেই কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে প'ড়েছে, এদের ভাষায় সামান্য-সামান্য পার্থক্য এসে গিয়েছে। গ্রীসে যে আর্য্যেরা যায়, আর গ্রীসের আর্য্য-পূর্ব যুগের সুসভ্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে যারা আসে, সেই পশ্চিমা আর্য্যদের ভাষা,—আর যে আর্য্যেরা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে উত্তর-পূর্ব এশিয়া-মাইনরে আর

বেদ-পূর্বীয় *Z´himala-, বৈদিক "হিম+আল", [৪] Shugamuna "মহামারীর দেবতা, জ্যোতির দেবতা"=বেদ-পূর্বীয় *S´auka-manas, বৈদিক 'শোক+মনস্', ([৩] ও [৪] সংখ্যক দেবতাদ্বয় ভারতবর্ষে বৈদিক জগতে আর প্রতিষ্ঠিত রহিলেন না), [৫] Dakash "নক্ষত্রদেব পিতা" =ভারতীয় Daksha "দক্ষ", ২৭ নক্ষত্রের পিতা, [৬] Indara=বৈদিক "ইন্দ্র" ("ইন্দর"—স্বরভক্তি-যুক্ত রূপ), [৭] Mitra=বৈদিক "মিত্র", [৮] Nashattiya=বৈদিক "নাসত্য", [৯] Uruwna বা Aruna= বৈদিক "বরুণ", রাজা বা প্রধানদের নাম, যথা—[১] Abirattash= বৈদিক রূপ "অভিরথঃ", [২] Shuzigash=বৈদিক রূপ "সুজিগঃ", [৩] Artamanya=বেদ-পূর্ব্ব *Rta-manyas, বৈদিক "ঋতমন্যুঃ", [৪] Arzawiya=বৈদিক "আর্জব্য", [৫] Biriamaza=বৈদিক "বীর্যরাজ"; [৬] Biridaswa=বৈদিক "বৃদ্ধাশ্ব", [৭] Dashru =সম্ভাব্য বৈদিক "দশ্রু" অথবা "দস্র"; [৮] Aitagama=বেদ-পূর্ব *Aitagama, বৈদিক "এতগাম", [৯] Indaruta=বেদপূর্ব * Indarauta, Indrauta, বৈদিক "ইন্দ্রোত", [১০] Namyawaza= সম্ভাব্য বৈদিক "*নাম্যবাজ"; [১১] Rushmanya=সম্ভাব্য বৈদিক "*রুচিমন্য", [১২] Shatiya=বৈদিক "সত্য", [১৩] Shubandu বৈদিক "সুবন্ধু"; [১৪] Shumitta, Shumittarash=বৈদিক "সুমিত্রঃ"; [১৫] Shutarna=সম্ভাব্য বৈদিক "*সুধর্ণ" বা "সুধর্ণি"; [১৬] Shutatna=বৈদিক "সুত (বা সৃত) তন", [১৭] Shuwardata =বৈদিক (সম্ভাব্য) "*সুবর্‌দাত, স্বর্দত্ত"; [১৮] Teuwatti=সম্ভাব্য বৈদিক "*স্তবাত্ত", [১৯] Turbazu=সংস্কৃত "তুর্বসু", বৈদিক "তুর্বশ"; [২০] Tushratta=বেদ-পূর্ব *Duzhratha, বৈদিক "দুরথ"; [২১] Artashumara=বৈদিক "ঋতস্মর"; [২২] Arta-

tama = বৈদিক "ঋতধাম" ; [২৩] Dashartı = সম্ভাব্য বৈদিক "*দাসর্তি" ; [২৫] Mattıwaza = সম্ভাব্য বৈদিক "*মথিবাজ" ; [২৫] Saushshatar = "সৌক্ষত্র" , ইত্যাদি। আর্য শব্দ যথা —[১] Marıa = বৈদিক "মর্য", যোদ্ধা ; [২] Aıka = প্রাগ্‌বৈদিক *Aıka, বৈদিক "এক" ; [৩] Tera = "ত্রি, ত্রয়" . [৪] Panza = "পঞ্চ"; [৫] Satta = "সপ্ত" ; [৬] Nava = "নব" , [৯] Tapashash = "তপস্‌" , [৮] Wartanna = "বর্তন" ; [৯] Wasanna = "বসন" (অবস্থান-অর্থে), ইত্যাদি। (এই নাম ও শব্দগুলি Acta Orıentalıa XI, ı, ii, ııı, খণ্ডে প্রকাশিত N D Mıronov কর্তৃক লিখিত Aryan Vestıges ın the Near East of the 2nd Mıllenary B C নামক মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া, Mıronov-সংগৃহীত যে-সকল নাম বা শব্দেব ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে, সেগুলি এখানে দেওয়া হ'ল না)। এই রূপ বৈদিক ভাষার সাক্ষাৎ জননী-স্থানীয় ভাষা ব্যবহাব ক'বৃত এমন আর্যদের আমবা আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব বৎসবে ও তার পরেও মেসোপোতামিয়া ও এশিয়া-মাইনবে দেখ্‌তে পাই।

আর্যেবা এই দেশে অবস্থান কালে সুসভ্য Ashur অশুব বা অসুর অর্থাৎ আসিবীয় এবং বাবিলোনীয় জাতির প্রভাবে পড়ে। আসিবীয়-বাবিলোনীয় জাতির বিবাট্‌ বিবাট্‌ ইমারত, আব এদের (বিশেষতঃ আসিবীয়গণেব) শৌর্য ও নিষ্ঠুরতা আর্যদেব অভিভূত কবে। আর্যদেব মধ্যে আসিবীয় বীতি-নীতিও বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করে। যন্ত্র-শিল্পে ও গৃহ-নির্মাণে দক্ষ, দেবতা-বিবোধী অসুর বা দানবেব কল্পনাতে, ভাবতে আ'স্‌বাব পবে আর্যজাতিব মনেব মধ্যে নিহিত অসুরজাতির স্মৃতির পরিণতি ঘটে।

যে-সকল আর্য গোত্র মেসোপোতামিয়ায় বাস ক'র্‌লে না, পূবের দিকে

এল', তারাই হ'ল ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্বপুরুষ। পর্শু বা পার্শ্ব বা পার্স, মদ, শক, পার্থব প্রভৃতি আর্য্য গোত্রগণ পারস্য-দেশেই র'য়ে গেল; ভরত, কুরু, মদ্র, শিবি, দ্রুহ্যু, ত্রিৎসু, পুরু, ভৃগু প্রভৃতি নানা গোত্র ভারতে প্রবেশ ক'রলে। মনে হয়, ভারত আর ঈরানে, অন্ততঃ পূর্ব-ঈরানে, তখন একই অনার্য্যজাতির লোকেরা বাস ক'রত; আর্য্যেরা এদেরই "দাস" বা "দস্যু" ব'লে উল্লেখ ক'রে গিয়েছে।

"দাস" বা "দস্যু"দের সঙ্গে ভারতের বাইরেই আর্য্যদের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের কথা কিছু-কিছু বৈদিক সাহিত্যে—ঋগ্‌বেদে—পাওয়া যায়। তার পরে ক্রমে এই অনার্য্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বময় মিলনও ঘ'টতে থাকে। অনুমান হয়, আর্য্যদের আসবার সময়ে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিনটী জাতির অনার্য্য বাস ক'রত। [১] Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু শ্রেণীর অনার্য্য—খাটো চেহারা, রঙ্ ঘোর কালো, চেপ্‌টা নাক, পুরু ঠোঁট, চুল কোঁকড়ানো—এরা বেশীর ভাগ সামুদ্রিক উপকূল-অঞ্চলে বাস ক'রত, সভ্যতা ব'লতে এদের বিশেষ কিছুই ছিল না, মাছ ধ'রে বা শিকার ক'রে খেত—এই জাতি এখন প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে, দক্ষিণ-ভারতে, আসাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও এদের একটু-আধটু অবশেষ বা চিহ্ন বিদ্যমান, খুব সম্ভব এরাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। [২] Austric অস্ট্রিক জাতি—একটী মত অনুসারে এরা উত্তর-পূর্ব পথ দিয়ে—আসাম-অঞ্চল দিয়ে—বর্মা আর ইন্দোচীন থেকে ভারতে প্রবেশ করে; অন্য মতে, এদের আদি বাস ছিল পশ্চিম-এশিয়ায়, সম্ভবতঃ এশিয়া-মাইনরে, ভারতবর্ষে এসেই এরা বিশিষ্টতা পায়। এদের চেহারা কি রকম ছিল তা ঠিক জানা যায় না—মনে হয়, আকারে এরা খাটো ছিল, নাক এদের চেপ্‌টা হ'ত—আর এরা যে ভাষা ব'লত, সেই ভাষা থেকে এখনকার কোল ভাষা আর খাসিয়া ভাষা হ'য়েছে, আর

এদের অন্য শাখা ইন্দোচীনে, মালয় দেশে, দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে ছড়িয়ে প'ড়েছে। গঙ্গার উপত্যকায়, আর মধ্য-আর দক্ষিণ-ভারতে এরা বেশী ক'রে ছ'ড়িয়ে প'ড়েছিল, হিমালয়-অঞ্চলেও যে এরা ছিল তার প্রমাণ আছে। ধানের চাষ, কতকগুলি ফলের চাষ, পান-সুপারীর ব্যবহার,—ভারতীয় সভ্যতায় এগুলি অস্ট্রিক জাতির দান ব'লে মনে হয়; আর তা ছাড়া, এদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে ও বিবাহের আর শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠানে, আর হিন্দুর পুনর্জন্ম-বাদের অন্তরালে অবস্থান ক'রছে ব'লে অনুমান হয়। অস্ট্রিক-ভাষী জনগণ উত্তর-ভারতের সমতল অংশে এখন হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়ে, তাদের পৃথক্ অস্ট্রিক্ অস্তিত্ব বর্জন ক'রেছে। [৩] দ্রাবিড় জাতি, এই দ্রাবিড জাতি দীর্ঘকায, সরল-নাসিক ও দীর্ঘ-করোটি ছিল ব'লে অনুমান হয়। ভারতের পশ্চিমের দেশের লোকেদের সঙ্গে এদের সংযোগ বা সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যেরা ভারতে আস্‌বার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে, পশ্চিম থেকে এদের ভারতে প্রবেশ ঘ'টেছিল ব'লে অনুমান হয। পশ্চিম-ভারতে আর দাক্ষিণাত্যে এদের প্রচুর বাস ছিল, তবে অনুমান হয, এরা উত্তর-ভারতে আর পূর্ব-ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল, অস্ট্রিক জাতের সঙ্গে মিলে একত্র বাস ক'রত। অস্ট্রিক (কোল) আর দ্রাবিড, এই দুই জাতির খুব মিলন আর মিশ্রণও ঘ'টেছিল ব'লে বোধ হয। দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিল, বড়ো-বড়ো বাড়ী-ঘর নগর প্রভৃতি বানা'ত,—হিন্দু সভ্যতার বাহ্য অনেক উপকরণ এই দ্রাবিডদেরই কাছ থেকে আহৃত; শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা ভারতে [illegible] জাতির মধ্যে প্রথমটা প্রচলিত ছিল, যোগ-সাধনার মূল-তত্ত্বও দ্রাবিড়দের মধ্যেই উদ্ভূত হয় ব'লে মনে হয়। মোহেন-জো-দড়ো আর হড়প্পার

বিরাট্ সভ্যতা দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক ব'লে বোধ হয়। দ্রাবিড়েরা আর্য্যদের মত গো-পালন ক'রত—কোল (অস্ট্রিক) জাতি তা ক'রত না; তবে অস্ট্রিকেরাই হাতীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল ব'লে মনে হয়।

এই তিনটী জাতি অথবা বিভিন্ন তিন প্রকার ভাষা ও সংস্কৃতি-যুক্ত জনগণ ব্যতীত, আরও একটী জাতির ভারতে আগমনের কথা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন—Proto-australoid নামে অভিহিত একটী আদিম জাতি, এরা নেগ্রিটোদের পরেই এসেছিল, সম্ভবতঃ পশ্চিম থেকে, কিন্তু এদের ভাষার কোনও নিদর্শন ভারতবর্ষে নেই। এ ছাড়া, সম্প্রতি Hevesy Vilmos (বা William Hevesy) নামে এক হঙ্গেরীয় পণ্ডিত, কোলেদের সঙ্গে Finno-Ugrian ফিন্নোউগ্রীয় জাতির (রুষদেশ, সাইবিরিয়া ও উত্তর-ইউরোপ যাদের আদিম বাসভূমি তাদের) সংযোগ ছিল ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু এ মত এখনও বিচারাধীন।

আর্য্যেরা ভারতে যখন প্রথম এল', দেশে সুসভ্য (অথবা মোটামুটি সভ্যতা-প্রাপ্ত) এই দুইটী বড়ো অনার্য্য জাতি বাস ক'রত। নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ দ্রাবিড়দের মধ্যেই হয়; অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতা, আর নবাগত আর্য্যদের সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতা। আর্য্যদের আগমনে দেশের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না। নবাগত আর্য্য আর পুরাতন অনার্য্য পাশাপাশি বাস ক'রতে লাগ্‌ল। আর্য্য, দ্রাবিড়, কোল (অস্ট্রিক)—এই তিন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আর রক্তের মিশ্রণ ঘ'টতে লাগ্‌ল। আর্য্য ছিল বিজেতা—অন্ততঃ পাঞ্জাব-অঞ্চলে বিজেতৃরূপেই তার প্রবেশ হ'য়েছিল; তার ভাষা ছিল খুব জোরের ভাষা, আর তার সংঘ-শক্তিও ছিল অসাধারণ। আর্য্যের ভাষা তাই সহজে

প্রতিষ্ঠা লাভ ক'র্লে; হয়তো তখনকার দিনেব দ্রাবিড আব কোল গোষ্ঠীব পবস্পর-বিবোধী অনার্য্য ভাষা আব উপভাষাব গোলমালেব মধ্যে আর্য্যভাষা একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসাবে উত্তব-ভাবতে প্রসাব লাভ কবে। আর্য্যেব ধর্মেব কতকগুলি অনুষ্ঠান, আব আর্য্যদেব কতকগুলি দেবতা অনার্য্যেবা মেনে নেয়। আবাব ধীরে-ধীবে অনার্য্যেব দেবতা, অনার্য্যেব ধর্মানুষ্ঠান, অনার্য্যের দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান, অনার্য্যেব ভক্তিবাদ, আর্য্যদেবও মনে ছাপ দিতে থাকে। অনার্য্য বাজা বা পুবোহিতেবা আর্য্যভাষা গ্রহণ কবাব সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্য-সমাজে গৃহীত হ'তে থাকে; একটা ক্রমবর্ধনশীল আর্য্য-ভাষী গোষ্ঠী বা সমাজ গ'ড়ে উঠ্তে থাকে। এইরূপে, সংস্কৃত-ভাষা যাব বাহন এমন মিশ্র আর্য্যানার্য্য সভ্যতা, বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্যদেব ভারতে আগমনেব পব থেকে ধীবে-ধীরে তৈবী হ'তে থাকে।

এইভাবে হিন্দু বা প্রাচীন ভাবতীয় national বা জাতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট রূপ ফুটে' উঠ্তে প্রায় হাজাব বছব লাগে। আর্য্যদেব ভারতে আগমন তাদেব মেসোপোতামিয়ায় প্রকট হওযাব কিছু পবে ঘটে, এটা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-ব পবে, কি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-ব দিকে, এই ঘটনা হ'য়েছিল। বুদ্ধদেবেব কালে—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-ব দিকে—হিন্দু সভ্যতাব কাঠামো তৈবী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনার্য্যদেব অস্ট্রিক আব দ্রাবিড দেবতাদেব লীলা-কথা, তাদেব বাজা-বাজড়াদেব প্রাচীন কাহিনী, এ-সব ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হ'য়ে, আর্য্যদের দেব-কাহিনী আব বাজ-কাহিনীব সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে সংযুক্ত হ'য়ে, বামায়ণ-মহাভাবত আব পুবাণেব মধ্যে স্থান পেলে। এইরূপ ব্যাপাব গ্রীসেও ঘটেছিল। সম্প্রতি এই ধরণেব একটা মতবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে যে, ক্ষত্রিয়েরা মুখ্যতঃ অনার্য্য বাজন্য-সম্প্রদায়ের লোক, দেশে আবহমান কাল থেকে যে অনার্য্য রাজাবা বাজত্ব ক'রতেন, নব-গঠিত মিশ্র হিন্দু-

সমাজে তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরাই ক্ষত্রিয়-রূপে গৃহীত হ'লেন। আবার এ মতও প্রকাশিত হ'য়েছে যে, ভারতবর্ষে দলে-দলে আর্য্যদের প্রবেশই ঘটে নি—কেবল আর্য্যের ভাষা আর আর্য্যের কতকগুলি ধর্ম-মত আর অনুষ্ঠান ঈরান থেকে ভারতবর্ষে প্রসৃত হয় মাত্র।

আর্য্যদের বিশেষ উপাসনা-রীতি হ'চ্ছে 'হোম'। দেবতারা আকাশে থাকেন, অগ্নি তাঁদের দূত বা মুখপাত্র, বেদি তৈরী ক'রে তা'তে কাঠের আগুন জ্বেলে সেই আগুনে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, পূষা, অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, উষা, মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘী, মাংস, যবের পুরোডাস বা রুটী, সোমরস এই-সব খাদ্যবস্তু আহুতি দেওয়া হ'ত, দেবতারা আগুনের মারফৎ সেই সব জিনিস পেয়ে খুশী হ'য়ে যে হোম ক'রত তাকে স্বর্ণ, অশ্ব, পুত্র-সন্তান, প্রচুর শস্য প্রভৃতি দান ক'রতেন। 'পূজা'র রীতি আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না—প্রতিমা বা অন্যরূপ দেব-প্রতীকের গায়ে ফুল, পাতা, চন্দন, সিঁদূর প্রভৃতি দেওয়া, চা'ল-ফল-মূলের নৈবেদ্য, অথবা বলিদানের পশুর মুণ্ড বা পাত্রে ক'রে তার রক্ত নিবেদন করা, এ-সমস্ত বৈদিক অর্থাৎ আর্য্য রীতি নয়। 'পূজা'-শব্দটীও মূলে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ ব'লে অনুমান হয়। এই অনার্য্য অনুষ্ঠান অনার্য্য দেবতাদের সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত হ'যে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হ'ল।

আর্য্যদের প্রথম আগমনের সময়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য্য ভাষা ব'লত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর্য্যদের আসবার বহু শত বৎসর পর পর্য্যন্তও এই সব অনার্য্য ভাষা জীবন্ত ছিল,—বুদ্ধদেবের সময়ে, এমন কি তার ৫০০।৬০০ বৎসর পরেও—উত্তর-ভারতবর্ষেরও অনেকখানি জুড়ে' জন-সাধারণ অনার্য্য ভাষা ব'লত, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। এই-সব অনার্য্যভাষীদের দ্বারা আর্য্যভাষা গৃহীত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এদের ধর্ম, দেবতা, আচার-অনুষ্ঠানও
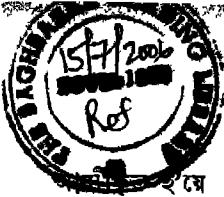
[illegible] হ'য়ে গেল, সেগুলি সর্বজন-গৃহীত হ'য়ে প'ড়্‌ল—পৌরাণিক দেবতাবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি এল'—বৈদিক ধর্মের চেয়ে গভীরতর উন্নততর ধর্মজীবন ভারতীয় সমাজে এল। অনার্য্যদের বড়ো-বড়ো দেবতা—শিব, উমা, বিষ্ণু—অনুরূপ আর্য্যদের দেবতাদেব সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন, তাঁদেব আবও মহনীয় ক'বে তুল্‌লেন। অনার্য্যদেব বৃক্ষ-দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, আব দৈবী শক্তির বিকাশ রূপে, দেবতা-রূপে কল্পিত নানা পশুপক্ষীব প্রতীকেব মাধ্যমে পূজা—এ-সবও এসে গেল।

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকেব প্রথমার্ধে আর্য্যদেব বৈদিক সাহিত্য, মিশ্র আর্য্যানার্য্য বা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র ব'লে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রায় সব শ্রেণীব ভারতীয়দেব কাছে গৃহীত হয়। আর্য্যদের পুরোহিত-শ্রেণী ব্রাহ্মণ জাতিবও প্রতিষ্ঠা এই সময়েই ঘটে। প্রথম যুগের বিজেতা আর্য্যদেব প্রভাব এরূপটী হওয়াব একটী কাবণ। বেদ গৃহীত হ'য়ে যাওয়ায় ও সমাজে ব্রাহ্মণেব প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায়, অনার্য্য ভাষাব প্রতিষ্ঠা হওয়া আব সম্ভবপব হ'ল না। কিন্তু অনার্য্য ভাষা সহজে ম'র্‌লও না। অনার্য্য শব্দ কিছু-কিছু প্রাকৃতে আর সংস্কৃতে ঢুক্‌ল, অনার্য্য চিন্তা-পদ্ধতিও সংস্কৃতে এসে' গেল। খ্রীষ্ট-জন্মেব ১৫০ বৎসব পূর্বে কলিঙ্গের জৈন-ধর্মাবলম্বী বাজা খাববেল মস্ত এক অনুশাসন প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষবে উৎকীর্ণ ক'বে যান – বাজাব এই অনুশাসন প'ড়ে কে বুঝ্‌বে যে তাঁব নাম আর্য্যভাষাব নয়, দ্রাবিড় ভাষাব, দ্রাবিড় 'কাব্' অর্থে 'কালো, কৃষ্ণ' এবং 'বেল্' অর্থে 'বল্লম,'—*'কাববেল' বা 'খাববেল' শব্দেব সংস্কৃত অনুবাদ হবে 'কৃষ্ণর্ষ্টি' (অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ঋষ্টি বা বল্লম যাব')। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র-বংশীয় বাজাবা যাঁবা খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে রাজ্য কবেন—তাঁদের বড়ো-বড়ো প্রাকৃত অনুশাসন আছে, তাঁদেব গোত্র-নাম হ'চ্ছে 'বাশিষ্ঠীপুত্র, গৌতমীপুত্র' প্রভৃতি; কিন্তু তাঁদের নিজেদের বংশ-নাম

'সাত-বাহন' শব্দটী আর্য্য ভাষাব নয়,—এ নামটী অনার্য্য কোলভাষাব, এই নামেব অর্থ হ'চ্ছে 'অশ্ব-পুত্র', যাব দ্রাবিড অনুবাদ এঁদেব একজন বাজাব ব্যক্তি-গত নামে 'বিলিবায়-কুব' অর্থাৎ 'বডবা-পুত্র' বা 'ঘোটকী-পুত্র' রূপে পাওযা যাচ্ছে। এই-সব থেকে, দু'হাজাব আডাই হাজাব বছব আগে ভাবতীয় জীবনে অনার্য্য উপাদান কত প্রবল ছিল, তাব একটা আভাস পাওয়া যায, আর্য্য প্রভাব কতটুকু উপব-উপব ছিল, তাও বোঝা যায।

ভারতীয হিন্দু সভ্যতাব বযস, পূর্বে নির্দিষ্ট ইতিহাস অনুসাবে খুব বেশী হবে না, এ কথায আমাদেব অনেকেব আত্মসম্মানে ঘা লাগ্‌বে। আর্য্যদের আ'স্‌বাব পূর্বে অনার্য্য দ্রাবিড আব কোলদেব ইতিহাস অবশ্য ছিল, তাব অনেক কিছু রূপান্তবিত আকাবে সংস্কৃত পুবাণে বক্ষিত হ'য়েছে। আর্য্যেবা আসাতেই হিন্দু জাতিব রূপ-গ্রহণে সাহায্য হ'ল, আর্য্য অনার্য্যেব পূর্ণ সামঞ্জস্য হ'ল খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকেব দ্বিতীয়ার্ধে। হিন্দু জাতিব আব সভ্যতার ইতিহাসে মোটামুটী দু'টী যুগ ধবা যেতে পারে—যজ্ঞেব প্রাধান্যেব যুগ, আব পৌরাণিক দেবতাদেব প্রাধান্যেব যুগ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ কি তাব ২।৪ শ' বছব আগে থেকে এই সভ্যতাব আবম্ভ, খ্রীষ্ট-জন্মেব কিছু পূর্ব থেকে ৮০০।১০০০ বৎসব ধ'বে এই সভ্যতাব সর্বাপেক্ষা গৌববময় কাল। পৃথিবীব অন্য প্রাচীন সভ্যতাব সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে, বযস হিসাবে আমাদেব হিন্দু সভ্যতা, মিসব, বাবিলোন, ঈজিয়ান-দেশেব সভ্যতাব চেয়ে ঢেব আধুনিক, আব কতকটা প্রাচীন গ্রীক আব প্রাচীন পাবসীক তথা প্রাচীন চীনা সভ্যতাব সমকালীন, গ্রীক সভ্যতা কিন্তু নিজ বিশিষ্ট মূর্তি খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকেব প্রথমার্ধেই প্রাপ্ত হয়, আব চীনা সভ্যতা অব্যাহত গতিতে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ থেকে শুরু ক'বে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকেব প্রথমার্ধেই নিজ পরিণত রূপ ধাবণ করে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাব

সর্ব্বাপেক্ষা গৌববময় যুগকে বোমান্ বা গ্রীকো-রোমান্ যুগের সভ্যতার, আব চীনেব হান্ ও থাঙ যুগেব সভ্যতাব জুড়ি বলা যায়।

হিন্দু সভ্যতাব অতি-প্রাচীনত্বে যাঁবা আস্থাবান্, তাঁবা জ্যোতিষেব প্রমাণ উপস্থিত ক'বে এই প্রাচীনত্ব প্রমাণ ক'র্‌তে চান। এ সম্বন্ধে খালি দুটো কথা ব'ল্‌তে চাই: এক—হিন্দু জ্যোতিষ গ্রীকেদেব সঙ্গে হিন্দুব পবিচয়ের পরেই পুষ্টিলাভ কবে, বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন সাহিত্যের জ্যোতিষিক উল্লেখগুলি কি ভাবে নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, আব, দুই—যাঁবা এই জ্যোতিষেব 'প্রমাণ' প্রয়োগ কবেন, তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য নেই, তা'থেকে বোঝা যায়, যুক্তিতর্কানু-মোদিত বিচাবেব যে এক পথ, যে scientific বা logical discussion আমাদেব একই জিনিস প্রমাণ ক'বে দেবে, সর্ববাদি-সম্মত সেই যুক্তি-তর্কানুমোদিত বিচাব-পদ্ধতি, সেই logical discussion এই জ্যোতিষিক আলোচনায় যেন ঠাঁই পাচ্ছে না। জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তে যে অতি-প্রাচীন তাবিখের কথা শোনা যায়, অন্য দিক্ দিয়ে তাব প্রতিকূলে এত বিষয় আছে, যে এই-সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তেব কোনটাই গ্রহণ-যোগ্য ব'লে মনে হয় না। বামায়ণ, মহাভাবত, পৌবাণিক সূর্য্য ও চন্দ্র বংশেব বাজাদেব তালিকা, এ-সবেব ঐতিহাসিকত্ব নিযে অনেক গবেষণা হ'য়েছে। যাঁবা প্রাচীন ইতিহাস যথাবীতি আলোচনা কবেন, তাঁদেব কেউই বামায়ণেব কোনও ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার কবেন না, মহাভাবতেব মধ্যে, মহাভাবত আব পুবাণের অনেক উপাখ্যানেব মধ্যে, কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকৃতে পাবে, এইটুকু স্বীকাব কবেন মাত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে হ'য়েছিল, এইরূপ মত দু'জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক—ইংবেজ Pargiter পার্জিটর সাহেব আব ভারতীয় হেমচন্দ্র বায়চৌধুবী—এঁবা প্রকাশ কবেছেন, এঁবা বিভিন্ন পথ ধ'রে বিচাব

ক'রেছেন, এঁদেব আলোচনা-পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত উড়িয়ে' দেবাব নয়। মহাভারতেব পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে একথাও বলা যেতে পারে, যে তাঁরা আর্য্য-পূর্ব যুগেব মানুষ—মহাভাবতের মূল আখ্যান অনার্য্য বাজাদেব নিয়ে, পরে অনার্য্য জাতির নবাগত আর্য্যজাতিব সঙ্গে মিশ্রণেব আর ভাষায় তাদের আর্য্যাকবণেব সঙ্গে-সঙ্গে, এই উপাখ্যানও পরিবর্তিত হ'ল, পল্লবিত হ'ল, শেষে আমাদেব সংস্কৃত মহাভারতে দাঁড়িয়ে' গেল, খ্রীষ্ট-জন্মেব কাছাকাছি কোনও সময়ে—আব আর্য্যানার্য্য-মিশ্র হিন্দুজাতির এক সাধাবণ জাতীয় সম্পত্তি হ'য়ে গেল ॥

এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব

সংস্কৃত ভাষাব প্রাচীন রূপ বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভারতবর্ষে আনীত হয, আর্য্যগণেব দ্বাবা। সুদূব রুষ দেশে উবাল পর্বতেব দক্ষিণে কাস্পিয়ান ও আবাল হ্রদদ্বয়েব উত্তবে, এখনকার কালে তুর্কী-ভাষী খিবৃঘিজ্ ও কাজ্জাক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজাব বৎসব পূর্বে, আদি ইন্দো-ইউবোপীয জাতিব লোকেরা বাস কবিত, ইহাদেব মধ্যে যে ভাষা ঐ সময়ে রূপ গ্রহণ কবিয়াছিল, তাহাই পববর্তী কয়েক বর্ষ-সহস্রকেব মধ্যে বিবিধ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতে পবিবর্তিত বা রূপান্তবিত হয়—হিত্তী, বৈদিক, অবেস্তা ও প্রাচীন পাবসীক, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রাচীন তুখাবীয়, প্রাচীন আইবিশ, প্রাচীন শ্লাব প্রভৃতি ভাষাতে, মূল ইন্দো-ইউবোপীয়েব পরিণতি ঘটে। কোন্ পথ ধরিয়া ইন্দো-ইউবোপীয়গণ তাহাদেব আদি পিতৃভূমি হইতে ভাবতবর্ষে আসে, তাহা ঠিক মত জানা যায় না; তবে কতকগুলি প্রাচীন লেখেব প্রমাণে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহাদের একটী দল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০-র দিকে, কৌবাস বা ককেসস্ পর্বতমালাব দক্ষিণে, মেসোপোতামিয়া বা ইবাকের উত্তরে, আধুনিক কালেব পূর্ব-তুর্কীদেশে ও উত্তর-পশ্চিম-ঈবানে, প্রথম দেখা দেয়। এখানে কিছুকাল ধবিষা ইহাবা অবস্থান করে, পবে ধীবে-ধীবে পূর্ব-তুর্কীদেশে, ইবাকে ও পশ্চিম-ঈরানে ইহারা প্রসৃত হয়, ও তৎপবে ঈবান ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে আসে।

আদি যুগেব ইন্দো-ইউবোপীয়েবা সভ্যতায় তেমন উন্নত ছিল না, ইহাদের তুলনায় মিসরী, প্রাচীন গ্রীসের আদিম অধিবাসী, এবং বাবিল্ ও

অসুর জাতির লোকেরা, নাগরিক সভ্যতায় অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়েরা কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগৎকে একটী জিনিস দান করে,—সেটী হইতেছে ঘোড়া; ইহাদের পিতৃভূমিতে ঘোড়া বন্য অবস্থায় চরিত, সেখানেই ইহারা ঘোড়া ধরিয়া পোষ মানাইয়াছিল, ঘোড়াকে বশে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ও তাহাকে দিয়া রথ বা গাড়ী টানাইয়া, সেই সুপ্রাচীন যুগে ইহারা মানব-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত গমনাগমন সহজ হইল, বিভিন্ন জাতির বিস্তৃতি ও পরস্পরের উপর প্রভাব-বিস্তার আগের চেয়ে আরও শীঘ্র এবং ব্যাপক-ভাবে ঘটিতে লাগিল। ইন্দো ইউরোপীয় জাতির লোকেদের কতকগুলি উপজাতি বা দল, উরাল-পর্বতের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়, ইউরোপের নানা দেশে ইহাদের বংশধরেরা প্রাচীন কেল্‌তীয়, ইতালীয়, জরমানীয়, হেল্লেনীয় বা গ্রীক, বাল্‌তীয় এবং শ্লাব প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হয়। আর একটি দল পূর্ব-মুখে গিয়া মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতে থাকে, ইহাদেরই উত্তর-পুরুষদের পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে উত্তর-সিন্‌-কিয়াঙ (বা চীনা তুর্কীস্থান) দেশে 'তোখারীয' জাতিরূপে দেখা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা মধ্য-এশিয়ার এই তোখারীয় জাতির সহিত পরিচিত ছিল ও ইহাদিগকে 'ঋষিক' ও 'তুখার' নামে অভিহিত করিত। এই-সব বিভিন্ন ইউরোপীয় দল ব্যতিরেকে আরও দুইটী দল এশিয়া-মাইনরের দিকে আসে, ইহাদের একটী কোনও অজ্ঞাত সময়ে এশিয়া-মাইনরের মধ্য-ভাগে উপনিবিষ্ট হয়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র দিকে ইহাদের ভাষা, হিত্তী বা কানীসীয় ভাষা, এশিয়া-মাইনরের একটী দুর্ধর্ষ শাসক জাতির ভাষা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে দেখা যায়। দ্বিতীয় দলটী ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের লইয়া, সম্ভবতঃ ককেসস্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইহারা উত্তর-ইরাকে ২২০০।২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আসিয়া উপনীত

হয়। এই দলটী হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আর্য্য-শাখা।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষের কয় শতকে আর্য্যদের অস্তুরা দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার অন্ধ তমিস্রা হইতে সুসভ্য এবং ইতিহাস-প্রবিষ্ট জাতিগণের সংস্পর্শে প্রথম আসিতেছে। অসুর-বাবিল-জাতীয় জনগণ তাহাদের প্রাচীন লেখ মধ্যে এই নবাগত আর্য্যদের আগমন উল্লেখ করিতেছে। আর্য্যদের আগমন উত্তর হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহারা ঐ অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনয়ন করিয়াছিল। অসুর-বাবিল দেশের অর্থাৎ প্রাচীন ইরাকের লোকেরা ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না—তাহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ভেঁড়া, ছাগল, উট ও গাধা ছিল, ঘোড়া ওদেশের পশু ছিল না, আর্য্যদের নিকট হইতে তাহাদের পিতৃভূমি হইতে আনীত ঘোড়া ইহারা পরে পাইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে, যখন উরাল-পর্বতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও দক্ষিণ-রুষ দেশের সমতল ভূভাগে আর্য্যগণ অথবা তাহাদের পিতৃপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয়গণ বাস করিত, তখন দক্ষিণের অসুর-বাবিল বা ইরাক দেশের লোকদের কাছ থেকে গোরুর প্রসার উত্তরে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যে ঘটিয়াছিল—আগে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ ঘোড়া ও ভেড়া মাত্র পুষিত, গাধা, গোরু ও ছাগল তাহাদের মধ্যে ছিল না; সুতরাং দেখা যাইতেছে, দক্ষিণের গোরু উত্তরে আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা গৃহীত হয়, এবং যেন তাহার পরিবর্তে উত্তরের ঘোড়া আর্য্যদের দ্বারায় দক্ষিণে আনীত হয়।

আর্য্যেরা ইরাকে আসিয়াছিল, কতকটা দলবদ্ধ-ভাবে লুঠ-তরাজ করিবার জন্য, ও জো পাইলে দেশে উপনিবিষ্ট হইবার জন্য; এবং কতকটা দুই একজন করিয়া, ঘোড়া বিক্রী করিবার উদ্দেশ্যে। যাহা হউক, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে আর্য্যগণ উত্তর-ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিত্তী বা কানীসীয় শাখার জাতিগণ এশিয়া-মাইনরে একটী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে—হিত্তী জাতির ভাষায় উৎকীর্ণ লেখমালা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইঁহাদের শ্রমের ফলে প্রাচীনকালের একটী বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতের একটু দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি—এইরূপ জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে ইহা গ্রীক, লাতীন, শ্লাব, জরমানিক, কেল্‌তীয় প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিক্ হইতে আর্য্য ভাষার শব্দ ও নাম অসুর-বাবিলদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখ-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। আর্য্যদের কয়েকটী শাখা ঐ সময়ের কিছু পরে, ইরাক-অঞ্চলে, স্বকীয় শৌর্য্য-বলে, কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়া লয়, ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে থাকে। 'মিতান্নি' নামে একটী আর্য্য-শাখা ইহাদের অন্যতম। 'কাস্‌সী' (=কাশি ?) নামে আর একটী শাখা ১৭৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাবিলন-নগরী অধিকার করিয়া লয়, এবং বাবিলনে কাশি-বংশীয় আর্য্য রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া রাজত্বও করে। 'মিতান্নি', 'কাশি', 'হারৃরি' বা 'আর্‌রি' (=আর্য্য ?) নামক এই সব আর্য্য বংশ, ঐ দেশের জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করার ফলে, ক্রমে নিজেদের আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায়, ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজ পৃথক্ জাতিসত্তা হারাইয়া ফেলে। ধীরে-ধীরে এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪০০।১৩০০-র পরে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষার অস্তিত্বের বহু প্রমাণ স্থানীয় লেখাবলীর মধ্য হইতে পাওয়া যায়।

ইরাকের অসুর-বাবিল জাতির লেখ ও অনুশাসনে রক্ষিত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ আনুমানিক ২০০০ হইতে ১৪০০ বা ১৩০০ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত আর্য্য ভাষার

শব্দ ও নাম পাওয়া যায়, সেগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার ভাষার শব্দ ও নাম বলা যায়। এই যুগের আর্য্যভাষা, একদিকে ভারতে আগত আর্য্যগণের বৈদিক ভাষা, ও অন্য দিকে ঈরানে উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের প্রাচীন ঈরানী (পারসীদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় ও পারস্যদেশে বাণমুখ লিপিতে পর্বত-গাত্রে ও অন্যত্র উৎকীর্ণ প্রাচীন-পারসীক অনুশাসনে রক্ষিত)—এই উভয় প্রকার ভাষার জননী। ইহাকে একসঙ্গে 'প্রাক্-সংস্কৃত' ও 'প্রাক্-ঈরানী' বলা যায়। ভারতে আর্য্যদের আগমন ঘটে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে—এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা ভারতে আসিয়া ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বাহন হইবার পূর্বেই, ইহার 'প্রাক্-সংস্কৃত' অবস্থাতেই একটী প্রতাপশালী জাতির ভাষা হিসাবে, পশ্চিম-এশিয়া-খণ্ডে ইহার কতকটা প্রতিপত্তি ও প্রসার ঘটে। অর্বাচীন-কালে সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া প্রাচীন ঈরানী ভাষার পরবর্তী রূপ প্রাচীন-পারসীক, মধ্য-পারসীক বা পহ্‌লবী এবং আধুনিক পারসীক বা ফারসী, ইরাকে ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যত্র, সেই প্রসার ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

'প্রাক্-সংস্কৃত' বা বৈদিক-পূর্ব আর্য্যযুগের সংস্কৃত তখনও কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতির বাহন হইতে পারে নাই, কারণ আর্য্য জাতি তখনও কতকটা আদিম যাযাবর অবস্থায় ছিল—পার্থিব সভ্যতায় ইহারা তখনও বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই, অসুর-বাবিলদের বিরাট ঐশ্বর্য্যময় সভ্যতা ইহাদিগকে তখন বিশেষ-ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, ইহারা নিজেরাই অনেক-কিছু নূতন বস্তু শিখিতেছিল। কিন্তু ইহারা ইরাক-অঞ্চলে ঘোড়া আনিয়াছিল, ঘোড়াকে শিখাইবার কালে আর্য্য অশ্বপালগণ যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিত সেইরূপ কতকগুলি শব্দ অসুর-বাবিল লেখের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই শব্দগুলির রূপ হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি

সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার শব্দ। যেমন, ঘোড়াকে মাঠে একবার দৌড় করাইতে হইলে বলিত aika-wartana = 'অইক-বর্তন', অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-বর্তন', তিনবার দৌড় করাইবার কালে বলিত terawartana- 'তের (= তির, বা ত্রি ?)-বর্তন', তদ্রূপ panza-wartana = পঞ্চ-বর্তন, satta-wartana = সত্ত ('সপ্ত' শব্দের বিকৃত রূপ)-বর্তন, nawa-wartana = নব-বর্তন; ঘোড়াকে থামানোকে বলিত wasana 'বসন'। অন্য শব্দের মধ্যে পাইতেছি maria = 'মর্য' (বৈদিক শব্দ, অর্থ 'বীর' বা 'মানুষ'), tapash = 'তপঃ' (উত্তাপ), দেবতার নাম = Shuriash = 'সূর্যঃ', Maruttash = 'মরুতঃ', Shugamuna = মহামারী অথবা জ্যোতির দেবতা, বৈদিক প্রতিরূপ 'শোকমনাঃ' (শুচ্ ধাতু দীপ্তি অর্থে, তাহা হইতে), Dakash = নক্ষত্রগণের পিতারূপে উক্ত দেবতা, সংস্কৃত 'দক্ষ' (= দক্‌ষ), Shimalia = *Z'himalia = উজ্জ্বল অর্থাৎ হিম বা তুষার-ধবল পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী, 'হিমালা', সংস্কৃত 'হিম' শব্দের প্রাচীনতর প্রাক্-সংস্কৃত বা আর্য্য রূপ z'hima- এখানে পাইতেছি, Indra = 'ইন্দ্র', Mitra = 'মিত্র', Nashattia = 'নাসত্য' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়, Uruwna বা Aruna = 'বরুণ', এবং রাজাদের নাম, যথা Abirattash = 'অভিরথঃ', Shuzigash = 'সুজীগঃ', Artamanya = 'ঋতমন্য', Arzawiya = 'আর্জব্য', Aitagama = *'অইতগাম', বৈদিক 'এতগাম', Artashumara = 'ঋতস্মর', Shuwardata = *'স্বর্দাত' বা 'স্বর্দত্ত', Tushratta = Duzhratha = 'দূরথ', ইত্যাদি। এই-সমস্ত শব্দ ও নাম হইতে, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা আসিবার পূর্বেই ইহার পূর্ব রূপ আর্য্য বা ভারত-ঈরানীয় ভাষা, কিরূপে এশিয়া-খণ্ডের সভ্য জনমণ্ডলে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০—এই সময়ের মধ্যে আর্য্য জাতির

জগৎকে আর কিছু দিবার ছিল না, এক অশ্ব-পালন ছাড়া, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অন্য জাতির উপরে আর্য্যদের প্রভাব, ভাষায় ও জীবনের অন্য দিকে তেমন কার্য্যকর হয় নাই। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০-র মধ্যে ইরাক হইতে আরও পূর্বে ঈরানে আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল, এবং ঈরান হইতে ভারতে আসিল। প্রাক্-বৈদিক ভাষা ইহাদের দ্বারা ভারতে আনীত হইল, উত্তর-পাঞ্জাবে ইহার প্রথম স্থাপনা হইল। ভারতে তখন অস্ট্রিক (কোল, মোন্-খ্মের) ও দ্রাবিড়-জাতীয় লোকের বাস ছিল; ইহাদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতি নাগরিক সভ্যতায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। নবাগত আর্য্যগণ শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ জাতির লোক হইলেও, নাগরিক সভ্যতায় দ্রাবিড়দের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। অস্ট্রিকদের সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতাই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আর্য্যগণ আংশিক-ভাবে যাযাবর ও আংশিকভাবে কৃষিজীবী ছিল। পাঞ্জাবেই আর্য্যদের বাস বেশী করিয়া ঘটে, কারণ ভারতের এই অঞ্চল আর্য্যদের কেন্দ্র-স্থানীয় ঈরানের পাশেই অবস্থিত ছিল। (ব্যাপক অর্থে 'ঈরান' বলিলে, পারস্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান এই তিন দেশকেই ধরিতে হয়।) পাঞ্জাব হইতে আর্য্যগণ প্রথমটায় পূর্বদিকে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রসৃত হয়, পরে সিন্ধু প্রদেশে ও দক্ষিণে মরুদেশে, ও গুজরাটের এবং মহারাষ্ট্রের দিকে ইহাদের বিস্তৃতি ঘটে। গঙ্গার দেশে বেশী করিয়া অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের মিশ্রণ ঘটে, এবং এই মিশ্রণের ফলে, উত্তর-ভারতে একটী নবীন জাতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়—সেটী হইতেছে প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা। বৈদিক যুগের পর হইতে এই সভ্যতা ধীরে-ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ইহার সংগঠনে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই আহৃত উপাদান মিলিত হয়। এই নবীন সভ্যতাকে 'পৌরাণিক হিন্দু' সভ্যতাও বলা যাইতে পারে। বৈদিক

সভ্যতা—ঋগ্‌বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি যাহার পরিচায়ক—তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ আর্য্যজাতির জিনিস। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতেই বেশী করিয়া জীবনে এবং ভাব-জগতে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। জৈন, বৌদ্ধ, এবং উত্তর কালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগ হইতে যে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা আরভমাণ আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের ফল।

এইভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য, বৈদিক-অবৈদিক অথবা হিন্দু সভ্যতা, একটী বিশিষ্ট বস্তু হইয়া দেখা দিল। আর্য্য জগতের প্রাচীন বৈদিক রূপ, আর্য্যদের বিশুদ্ধি, আর রহিল না, অনার্য্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জগৎ-ও আর অবিমিশ্র রহিল না। ভিতরে ভিতরে বহু অনার্য্য ভাব, চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠান এই নবীন মিশ্র সভ্যতায় স্থান পাইল। কিন্তু বাহির হইতে হইল আর্য্যের ভাষার জয়-জয়কার। উপর-উপর আর্য্য ভাষা ঠিক আছে বলিয়া মনে হইলেও, ইহাতে বহু অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করিল, এবং নানা-স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ইহাতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব আসিল, বৈদিক ভাষার ভাঙ্গন ধরিল। আর্য্যের বৈদিক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃতের রূপ ধারণ করিতে লাগিল—পূর্ব ভারতেই এই পরিবর্তন একটু দ্রুত ঘটিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৫০০-৪০০ শতকে পশ্চিম-পাঞ্জাব অঞ্চলে—পাণিনির দেশে—প্রচলিত আর্য্য ভাষা তখনও বৈদিক যুগের ভাষা হইতে বেশী পরিবর্তিত হয় নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলের এই 'লৌকিক' বা কথিত ভাষার আধারে, পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্য্যদের এবং স্বয়ং পাণিনির চেষ্টায়, একটী সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিল, যেটী 'সংস্কৃত' নামে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল; এবং প্রথম-প্রথম বৌদ্ধ ও জৈনেরা পূর্ব-ভারতের ও মধ্য-ভারতের কথিত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত (মাগধী, পালি ও অর্ধমাগধী) যদিও তাহাদের

সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ব্যবহার করিত, তথাপি ক্রমে তাহারাও ব্রাহ্মণদের মত সংস্কৃতকেও মানিয়া লইল। এদিকে সংস্কৃত ভাষা নিজেও প্রাকৃতের প্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন মুখ্য রূপে প্রকাশিত নবীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর-ভারতে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতি বা সভ্যতা, যেমন-যেমন উত্তর-ভারত বা আর্য্যাবর্তের গণ্ডী বা সীমা ছাপাইয়া ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে লাগিল, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র পর হইতে, তেমনি-তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে কথ্য ভাষা হিসাবে বিবিধ প্রকারের প্রাকৃত এবং সর্বজন-মান্য সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কৃতও প্রসারিত এবং জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে লাগিল। এইভাবে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা বিহার হইতে বাঙ্গালাদেশে, আসামে ও উড়িষ্যায় আগমন করিল, সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্য ভাষাও তাহার সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতকে লইয়া এই-সমস্ত প্রদেশকে জয় করিল, স্থানীয় অনার্য্য ভাষার লোপ সাধন করিয়া অথবা সেগুলিকে কোণ-ঠেসা করিয়া দিয়া, এই প্রদেশগুলিকে আর্য্যাবর্তের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিল। সেই ভাবে গাঙ্গেয় মিশ্র আর্য্যানর্য্য বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্য ভাষা সংস্কৃতকে লইয়া দাক্ষিণাত্যেও পহুঁছিল, এবং উত্তর-মহারাষ্ট্রকেও আর্য্যাবর্তের অংশ করিয়া দিল। আরও দক্ষিণে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রবিড় বা তমিল দেশ ও কেরলে, আর্য্যাবর্তের সভ্যতা গৃহীত হইল, সংস্কৃতও গৃহীত হইল, কথ্য আর্য্য ভাষা প্রাকৃত কিন্তু অত দূর দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষাগুলির স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ এই-সব দ্রাবিড় ভাষাতে স্থান পাইল,—আর সংস্কৃতের তো কথাই নাই। কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে, সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধতম ও প্রাচীনতম দ্রাবিড় ভাষা 'চেন্-তমিড়্' বা প্রাচীন তমিলে যে-ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে

সংস্কৃত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই, কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের আশ-পাশের শতকগুলিতে, এখন হইতে ১৮০০।২০০০।২২০০ বৎসর পূর্বে, সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আদি-দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সংস্কৃত কি-ভাবে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তমিলের এই-সব বিকৃত সংস্কৃতজ শব্দ হইতে বুঝা যায়। যেমন—'ঋষি' হইতে প্রাচীন তমিল 'ইরুটি,' 'শ্রী' হইতে 'তিরু', 'স্নেহ' হইতে 'নেয়্' ও 'নেচম্', 'ব্রাহ্মণ' হইতে 'পিরামণন্', 'সহস্র' হইতে 'আয়িরম্', 'ধর্ম' হইতে 'তন্মম্' ও 'তরুমম্,' 'সভা' হইতে 'অবৈ', 'সন্ধ্যা' হইতে 'অন্তি,' 'শীর্ষ' হইতে 'ঈয়ম্', 'কৃষ্ণ' হইতে 'কিরুট্টিণন্' (এবং 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'কণ্হ' হইতে 'কন্নন্')—এইরূপ শত-শত শব্দ আছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের উপরে সংস্কৃতের প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা সুসভ্য দ্রাবিড় জনগণের ভাষাগুলিকে নিজ রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, এখন হইতে ২০০০।১৮০০ বৎসর পূর্বেই।

নিখিল ভারত জুড়িয়া আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপে সংস্কৃতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্যের সংস্কৃত, 'লৌকিক সংস্কৃত' রূপ গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক শতকের মধ্যেই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের আর্য্য ভাষার (বিশেষ করিয়া, ইহার প্রতীক এবং প্রাচীন ও সাহিত্যিক রূপ হিসাবে, সংস্কৃতের) দিগ্বিজয়, ভারতের বাহিরে আরম্ভ হইল। মুখ্যতঃ ব্যবসায়-সূত্রে, স্থল-পথে ও জল-পথে, হিন্দু-সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ উভয় মতের হিন্দু, ভারতের আশ-পাশের দেশ-সমূহে গতায়াত আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ হিন্দু সভ্যতার নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ভারতের অনার্য্যগণ অন্যদেশে যাওয়া-আসা করিত—বিশেষতঃ অস্ট্রিক-জাতীয় অনার্য্যগণ স্থল-পথে ব্রহ্মদেশে ও জল-পথে মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, এবং

শ্যামে ও কম্বোজে যাইত, এই-সব দেশে অস্ট্রিক অনার্য্যদের জাতিদেরই বাস ছিল, তাহাদের সহিত প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই; এবং উত্তর-ভারত ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আর্য্য ও হিন্দু হইয়া গেলেও, সেই সংযোগ-সূত্র রক্ষিত হইয়াছিল, বরং আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল। হিন্দু যুগে, খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের কয়েক শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, সংস্কৃত ভাষা এইভাবে একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঈরানে ও মধ্য-এশিয়ায় আর্য্যদের জাতিদের মধ্যে, ঈরানীয় শাখার পার্থর বা পহ্লব, সুগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় (অথবা শুলিক বা চুলিক), এবং কুস্তন বা খোতনের অধিবাসীদের মধ্যে, ও তাহাদের উত্তরে ঋষিক বা তুষার (তোখারীয়) জাতির মধ্যে, প্রসার লাভ করিল (মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই এই অঞ্চলে আর্য্যভাষার বিস্তার ঘটিয়াছিল), তেমনি অন্যদিকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশে (দক্ষিণ ও মধ্য-ব্রহ্মের অস্ট্রিক শাখার মোন্-জাতির মধ্যে, মধ্য-ব্রহ্মের এবং পরে উত্তর-ব্রহ্মের চীন-ভোট জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার ম্রন্-মা বা বর্মী জাতির মধ্যে), শ্যামে (দক্ষিণ-শ্যামের মোন্‌দের মধ্যে ও পরে উত্তর-শ্যামের চীন-ভোট জাতির শ্যাম-চীন শাখার দৈ বা থাই অথবা শ্যামীদের মধ্যে), কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যে, চম্পা বা কোচিন-চীনের চাম জাতির মধ্যে, মালয়-উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মালয়দের মধ্যে, যবদ্বীপে, মদুরায় ও বলিদ্বীপে, বোর্‌নিওতে, এবং সুদূর ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে (হিন্দুত্ব এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় রূপেই প্রচারিত হইয়াছিল), সংস্কৃত ভাষাও নূতন-নূতন প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিল,—ঐ-সব দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিরই মত সংস্কৃতের ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই, ওদিকে কাস্পিয়ান হ্রদ ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-ঈরান ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ

ও লঙ্কাদ্বীপকে ধরিয়া, এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ-ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোর্নিও, সেলেবেস্‌ ও ফিলিপ্পীন পর্য্যন্ত লইয়া, এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিল, এই বৃহত্তর-ভারতের লোকেরা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করিয়া) ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয় হইয়া উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের ভাষা লিখিত ভাষা ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত বর্ণমালায় তাহাদের ভাষা-সমূহ প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের—বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং রামায়ণ মহাভারতাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের—অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল বা সুদৃঢ় করা হইল, সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে লাগিলেন, ঠিক ভারতবর্ষে যেমনটী হইত। তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, ও ভারতীয় অক্ষরে তাহাদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্দ এই-সকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ('তৎসম' শব্দ) ও বিকৃত-সংস্কৃত ('অর্ধতৎসম') শব্দের সম্ভারে, তাহাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইল, আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠীর মত, তেলুগু কানাড়ী মালয়ালম্‌ তমিলের মত, উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ মধ্য-এশিয়ার খোতনী ভাষা ও তোখারী ভাষা আবশ্যক-মত সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করিত (এ বিষয়ে সুগ্‌দ বা শুলিক ভাষা একটু স্বতন্ত্র ছিল, এই ভাষা ছিল সমৃদ্ধ পহ্লবী ভাষার ভগিনী, এইজন্য সংস্কৃত হইতে শব্দ ধার করার রীতি ইহাতে ততটা প্রবর্তিত হয় নাই), এবং মোন্‌ ও খ্মের ভাষা, চম্পার চাম ভাষা, পরবর্তী কালে বর্মী ও শ্যামী ভাষাদ্বয়, মালাই ভাষা, ও বিশেষ করিয়া যবদ্বীপীয়, সুন্দা-ভাষা, মদুরী ও বলিদ্বীপীয়, সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়া নিজ পুষ্টিসাধন-বিষয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিরই

শামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিংহলের সিংহলী ভাষা তো ভারতের আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত—গুজরাট হইতে যে প্রাকৃত খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে সিংহলে নীত হয়, তাহাই পরে সিংহলী ভাষাতে পরিণত হয়, —প্রথম হইতে সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল, এবং এখনও আছে।

সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া ও সিন্‌-কিয়াঙ্‌ বা চীনা-তুর্কীস্থান, ইন্দিয়া-মিনোর (ইণ্ডিয়া-মাইনর) বা লঘু-ভারত বা অগ্র-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের আফগানিস্থান, ইন্দোচীন বা ভারত-চীন, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন; মালায়া বা মালয়-উপদ্বীপ, এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত,—এই-সমস্ত দেশ লইয়া, এশিয়ার এই বিরাট অংশে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি, প্রায় সমস্ত পণ্ডিত লোকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ব্রাহ্মণেরা, সংস্কৃত জানিত, সংস্কৃত বুঝিত। দ্বীপময় ভারতের একজন যবদ্বীপীয় ও মধ্য-এশিয়ার একজন তোখারী ভিক্ষু তখন অক্লেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন, এবং এই আলাপে ক্বচিৎ একজন চীনা ভিক্ষুও যোগদান করিতে পারিতেন। তিব্বত ও চীন, এবং চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান এবং তোঙ্‌-কিঙ্‌ ও আনাম—এ কয়টী দেশ নিজ-নিজ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল; এই দেশগুলি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় রীতিনীতি এ-সব দেশের স্বকীয় ও প্রাচীন রীতিনীতির উপরে ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতির উপরে সম্পূর্ণ-রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্‌-কিঙ্‌-আনাম-কে ঠিক 'বৃহত্তর ভারত' বলা যায় না। কোরিয়া, জাপান, তোঙ্‌কিঙ্‌ আনামকে বরং 'বৃহত্তর চীন' বলা যায়।

চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম পহুঁছিয়াছিল প্রথমটা মধ্য-এশিয়ার খোতন ও তুষার (তোখারী) রাজ্যের লোকেদের মারফৎ, পরে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ ঘটে, এবং ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া ও জল-পথে যবদ্বীপ হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্মগুরুগণ চীনে যাইতে আরম্ভ করেন, চীন হইতে উত্তরের স্থল-পথে ও দক্ষিণের জল-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ-যাত্রীরাও ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। যে-সব ভারতীয় ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও প্রচারক চীনে গিয়াছিলেন, চীনাদের সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং চীন-ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও জীবনী বহু স্থলেই চীনদেশে রক্ষিত হইয়া আছে, ইহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ করিয়া করিতে হয়—মধ্য-এশিয়ার তুষার-জাতীয় পণ্ডিত কুমারজীব (ইঁহার পিতা কুমার ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং মাতা জীবা ছিলেন তুষার-দেশের কুচী-নগরীর রাজ-কুমারী, পিতা ও মাতার নাম মিলাইয়া পুত্রের নাম হয় 'কুমারজীব'), এবং দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্ম। চীন-দেশীয় পণ্ডিত ও ভারত-যাত্রীদের মধ্যে ফা-হিয়েন (সংস্কৃত নাম—মোক্ষ-দেব), হিউয়েন্‌-ৎসাঙ্‌ (মহাযান-দেব) এবং য়ী-ৎসিঙ্‌ (পরমার্থ-দেব) সুপরিচিত। চীনা অনুবাদের প্রচার কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্‌-কিঙ্‌-আনামেও হয়, কারণ ঐ দেশগুলির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ চীনেরই সভ্যতা। চীনারা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে সংস্কৃতের চর্চা করিত, এবং সংস্কৃত শিখিবার জন্য চৈনিক পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত-চীনা অভিধানও কতকগুলি প্রণীত হয়, এই অভিধানগুলির সাহায্যে কোরিয়াতে এবং জাপানেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাঝে-মাঝে সংস্কৃত পাঠ করিবার প্রয়াস করিতেন। এইরূপ দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে সঙ্কলিত হয়, ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন পুঁথি হইতে কাঠে খোদাই করিয়া জাপান হইতে এইরূপ দুইখানি অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিছুকাল হইল

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই দুইখানি অভিধান, মূল জাপানী সংস্করণের ছায়া-চিত্র প্রতিলিপি করিয়া ও ফরাসী ভাষায় নানা মূল্যবান্ টীকাটিপ্পনী দিয়া, পারিস হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন—এই বই, ও ডাক্তার বাগচী-রচিত চীন-দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত দুই খণ্ডের বিরাট্ পুস্তক, আধুনিক যুগে ভারতীয়দের মধ্যে চীন-ভাষার চর্চার প্রথম ফল। অভিধান দুইখানিতে প্রথম দেওয়া আছে চীনা শব্দ, তাহার নীচে সপ্তম শতকের ভারতীয় অক্ষরে (যাহার সহিত ঐ যুগের ও পরবর্তী যুগের চীনারা ও জাপানীরা পরিচিত ছিল) সংস্কৃত শব্দটী (চীনা লিপির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত শব্দের অক্ষরগুলি উপর হইতে নীচে দেওয়া হইয়াছে), সংস্কৃত শব্দের পাশে চীনা অক্ষরের সাহায্যে প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ—এইভাবে অভিধান রচিত হইয়াছে। একটী চীন শব্দের একটী করিয়া মাত্র সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

ভোট বা তিব্বতীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সুবিখ্যাত রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র রাজত্ব কালে। ঐ সময়ে ভোট পণ্ডিত থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে ভোট বা তিব্বতী লিপির গঠন করেন। ভোট-ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত অনেক অন্য সংস্কৃত গ্রন্থও ভোট-ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে, ভোটদের মধ্যে নিজ ভাষায় একটী বিরাট্ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনাদের লিপি, ধ্বনি-নির্দেশক নহে; ইহা মুখ্যতঃ বস্তু-চিত্রময় ও ভাব-নির্দেশক বর্ণ-সমূহের সমষ্টি। বিদেশী ভাষার ধ্বনি চীনারা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না, এবং তাহাদের লিখন-রীতি ধ্বনি-নিরপেক্ষ হওয়ায়, চীনারা বিদেশী নামেরও যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া নিজ ভাষার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস করিত, বিদেশী ভাষার শব্দের তো

কথাই নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত অল্প কতকগুলি সংস্কৃত নাম ও শব্দ যথাযথ সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা গেলেও, সাধারণতঃ তাবৎ সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ চীনাতে অনূদিত হইয়াছে। 'বুদ্ধ' এই শব্দটী প্রাচীন চীনারা 'বুধ্' এইরূপে গ্রহণ করে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ; এবং একটী বিশেষ বর্ণ বা চিহ্ন দ্বারা এই 'বুধ্' শব্দের নির্দেশ তাহারা করিত। বর্ণ বা চিহ্নটী অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু শতকের পর শতক ধরিয়া তাহার উচ্চারণ বা ধ্বনি পরিবর্তিত হইতে লাগিল, এবং সেই-সব পরিবর্তন ধরিবার কোনও উপায় তখনও ছিল না, এখনও নাই, বিশেষ গবেষণা করিয়া এখন তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিকে 'বুধ্' শব্দের চীনা উচ্চারণ 'ভ্যুঅদ্' বা 'ভ্যুৎ' হইয়া যায় ; পরে 'ভূৎ', এবং 'ভ্বাৎ, ভুৎ' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে, এবং আজকাল চীনের বিভিন্ন প্রান্তে এই শব্দ 'ফু, ফো, ফাৎ, ফ্বাৎ' প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে চীনাদের কাছ থেকে বর্মীদের পূর্ব-পুরুষগণ ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধ-বাচক চীনা শব্দ 'ভুৎ' তাহারা শিখিয়া লয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে যখন বর্মী-ভাষা ভারতীয় লিপিতে প্রথম লিখিত হয়, তখন বর্মীরা ইহা 'ভুরাঃ' রূপে লেখে, এখনও বর্মীতে ঐ বানানই প্রচলিত আছে, তবে উচ্চারণ বদলাইয়াছে—আরাকানে 'ভুরাঃ' উচ্চারিত হয় 'ফরাঃ' রূপে ও ব্রহ্মের অন্যত্র 'ফয়া' রূপে। এইভাবে সংস্কৃত শব্দটীর বিকার, চীনাদের মধ্যে, ও চীনাদের কাছ থেকে ইহাকে লওয়ার পরে বর্মীদের মধ্যে, ঘটিয়াছে। চীনাতে যে অল্প কয়েকটী সংস্কৃত নাম গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিক উচ্চারণে প্রায়ই এইরূপ বিকার দেখা যায়, যেমন, 'ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা' (বা ব্রাহ্মণ)=প্রাচীন চীনা উচ্চারণে 'ব্রম্' বা 'বম্', আজকাল 'ফান্', জাপানীদের মুখে 'বোন্'

বা 'বোঙ্', , 'যক্ষ (=য়ক্ষ)', আধুনিক চীনায় 'য়াৎ-সেন্' (চীনা জন-নায়ক সুন্ য়াৎ-সেন্-এর ব্যক্তি-গত নামে এই সংস্কৃত শব্দটাই দেখা যায়—'সুন্'-বংশীয় 'য়াৎ-সেন্' বা 'যক্ষ' অর্থাৎ 'দেব'), 'সংঘ'='স্যঙ্', 'অমিতবুদ্ধ' (অমিতাভ)='ও-মি-তো-ফু', 'ব্রাহ্ম।'=প্রাচীন চীনা 'বা-লা (বা বা)-মন্' =আধুনিক 'পো-লো-ম্যন্', 'ধ্যান' (প্রাকৃত 'ঝাণ')=আধুনিক উচ্চারণে 'ছান্' ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অতি অল্প; চীনাদের চেয়ে বরং জাপানীরা পরে আরও বেশী সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে। চীনারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীদের নাম পাঠ করে, এইজন্য শত-শত অনূদিত সংস্কৃত নাম ও শব্দ চীনা ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সেগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে। 'অশ্ব-ঘোষ'-কে 'মা-হেঙ্' (অর্থাৎ 'ঘোড়ার হ্রেষা') বলিলে, 'তথা-গত'-কে 'ঝু-লাই' (অর্থাৎ 'সেই-পথে যিনি-গিয়াছেন') বলিলে, 'অবলোকিত-স্বর (=অবলোকিতেশ্বর)'-কে 'কুআন্-য়িন্' (অর্থাৎ 'যিনি কণ্ঠস্বরের দিকে অবলোকন করেন'), 'ধর্ম-সিংহ'-কে 'ফা-শিঃ', অথবা 'ক্ষিতি-গর্ভ'-কে 'তী-ৎসাঙ্' বলিলে, সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও পক্ষে চীনা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ধরা সম্ভবপর নহে। এই প্রাচীন রীতি—নামের অর্থের অনুবাদ, নামের ধ্বনি-নির্দেশ নহে—ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথের চীনা-নামকরণ হইয়াছিল 'চু চেন্-তান্' ('চু' অর্থাৎ 'থিয়েন্-চু'='সিন্ধু'-দেশ, India, ভারতবর্ষ; 'তান্' অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা প্রভাত সূর্য্য=রবি; 'চেন্' অর্থাৎ বজ্র, বজ্রের দেবতা=ইন্দ্র)।

জাপান ও কোরিয়ার ভাষা এবং তোঙ্-কিঙ্-এর ভাষা চীনা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু চীনা হইতে সহস্র সহস্র শব্দ এই তিন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, এবং চীন হইতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত) শব্দ অথবা শব্দানুবাদ, এই তিন ভাষায় আগত এই-সমস্ত চীনা শব্দেরই অন্তর্গত।

জাপানী ও কোবিয়ান ভাষায় ও তোঙ্-কিঙের ভাষায় এই শব্দগুলিব উচ্চাবণ আবার অন্য ধবণেব হইয়া গিয়াছে। এইরূপ শব্দেব খুঁটিনাটি বিচাবেব আবশ্যকতা নাই। তবে জাপানীবা নূতন কবিয়া বৌদ্ধ ধর্মেব চর্চা আবম্ভ করিবাব ফলে এবং নূতন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আবম্ভ কবায়, আজকাল কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সবাসরি সংস্কৃত হইতে জাপানীতে আসিয়া গিয়াছে। জাপানে দেবনাগরী অক্ষবে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, প্রধান-প্রধান উপনিষদ্ ও ভগবদ্-গীতাবও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত নামগুলিব যথাসম্ভব প্রাচীন চীনা অনুবাদই ব্যবহৃত হইয়াছে ; যেমন 'ধৃতবাষ্ট্র' = 'জি-কোকু' (= 'যিনি বাজ্যকে ধাবণ বা বক্ষা কবেন', চীনাতে 'ত্তি-কুও')। আধুনিক জাপানীতে প্রচলিত কতকগুলি নবীন ও প্রাচীন কালে আগত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত—'বুদ্ধ' = প্রাচীন চীনায় 'বুধ্', 'ভ্যুৎ', তাহা হইতে প্রাচীন জাপানীতে 'বুতু', আধুনিক জাপানীতে, উচ্চাবণে 'বুৎসু' Butsu, লেখায় কিন্তু Butu 'বু-তু', 'ব্রাহ্মণ' = 'বাবামোঙ্', 'বসিষ্ঠ' = 'বাশী', 'যম' = 'যেমা' ; 'দুন্দুভি' = প্রাচীন জাপানীতে 'তুতুমি', আধুনিকে tsudzumi 'ৎসুদ্‌জুমি' ; 'বৈবোচন' = 'বিরুশানা', 'বৈদূর্য্য' = 'রুবি' (= 'লুরি', 'বেলুবি, বেলুরিয়' হইতে) ; 'সূত্র' = 'সুতাবা' ; 'বোধি' = 'বোদাই', 'সঙ্ঘাবাম' = 'গাবাঙ্' ; 'প্রজ্ঞা' = প্রাচীন জাপানীতে 'পানৃঞা', আধুনিকে 'হানৃঞা' ; 'ভিক্ষু, ভিক্ষুণী' = 'বিকু, বিকুনি', 'সঙ্ঘ' = 'সো' (অর্থ, 'পুরোহিত') ; 'বেদ' = 'বিদা' ; 'মণ্ডল' = 'মান্দাবা, মাদাবা' (অর্থ —'বর্ণ-মণ্ডল, বিভিন্ন বঙ্গের সমাবেশ') ; 'সমাধি' = 'সাম্মাই' ; 'শ্রমণ' = 'শামোঙ' ; 'পুণ্ডবীক' = 'হুন্দারিকে' ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সব শব্দ ও নাম বেশীব ভাগ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব দেবতা ও ভাবাবলী সম্পর্কীয় শব্দ।

দ্বীপময় ভাবতেব যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয, মালাই প্রভৃতি ভাষায় প্রচুব সংস্কৃত শব্দ স্থান কবিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ, যথা শার্দুলবিক্রীড়িত,

শিখরিণী, বসন্ততিলক প্রভৃতিও, যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিশেষ প্রচলিত, বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের গদ্যানুবাদের আরম্ভ এইরূপ, ইহা হইতে প্রাচীনকালে যবদ্বীপে সংস্কৃতের প্রভাব অনুমান করা যাইবে—

হন পূর মঙ্‌কে বুবু'সন্, ইকঙ্‌ কাল তন্ হন্ আদিত্য চন্দ্র নক্ষত্র বায়ু আকাশাদিক, প্রলয রি বেকস্ সংহারকল্প, প্রাপ্ত ম্বঙ্‌ সর্গকাল প্রতিনিয়ত মিজিল্ স-প্রকার-এঙ্‌ ঙুনি ইচ্চা সঙ্‌-হ্যঙ্‌ তিনুৎঞান্ হন কাতকান্ শব্দ সংহারধর্ম, সঙ্‌-হ্যঙ্‌ শঙ্কর অতঃ কারণ-ঞান্ হন লারন্ ভট্টারী দেহার্ধ, কারণ নির মপিসন্ লারন্ ভট্টার ত্রিনেত্র শির, অন্ মুঙ্‌খি ঙ্‌ কৈলাশ-শিখর সদৃশ উত্তুঙ্গ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ, সাক্ষাৎ মণ্ডলম্ স-ভুবন ইকা তঙ্‌ পর্যঙন্ স্থান সঙ্‌-হ্যঙ্‌।

দ্বীপময় ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সংস্কৃতের প্রচলন ও প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; আমার 'দ্বীপময় ভারত' পুস্তকে (যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ ভ্রমণের কথায়) এ বিষয়ে উল্লেখ ও উদাহরণ মিলিবে। আমাদের দেশে হিন্দীর মত, মালাই-ভাষা দ্বীপময় ভারতে বহু-প্রচলিত। মালাই-জাতির লোকেরা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—আর তাহারা সংস্কৃত হইতে প্রাচীন কালের মত শব্দ গ্রহণ করে না, সংস্কৃতের চর্চা তাহাদের মধ্যে আর নাই, তাহারা এখন আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ওলন্দাজ প্রভৃতি সব ভাষা হইতে শব্দ লইয়া থাকে, তথাপি সংস্কৃত শব্দ মালাই ভাষাতে ভূরি-ভূরি এখনও ব্যবহৃত হয়; এমন কি 'আমি'-অর্থে যে শব্দ মালাই ভাষায় আজকাল প্রচলিত, সেই saya 'সায়া' শব্দটী, সংস্কৃত 'সহায়' শব্দের বিকার ('আমি' অর্থাৎ 'আপনার সহায় বা আপনার দাস,'— এই বিনয়-প্রদর্শন হইতে 'সহায' অর্থে 'আমি,' যেমন 'আমি' না বলিয়া 'দাস' বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা)। মালাই-ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত—'আগম (=ধর্ম), অল্প (গাফিলতি

অর্থে), অংকাব (= অহংকাব, অর্থ—জবরদস্তী, অত্যাচাব), আন্তাবা (= অন্তর, পার্থক্য), আতাউ (= অথবা), বাহাসা, বাসা (= ভাষা), বাক্তি (= ভক্তি, অর্থ—স্বকৃতি, সেবা), বাংসা (= বংশ, জাতি), বিয়াসা (= অভ্যাস), বিজাকসানা (= বিচক্ষণ, অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী), বিনাসা (= বিনাশ), বুতা (= ভুত), বুদি (= বুদ্ধি), বুমি (= ভূমি), চাহায়া (= ছায়া, অর্থ—তেজ, দীপ্তি), চেক্রাবালা (= দিক্-চক্রবাল), চিন্তা, চিন্তামানি (= চিন্তামণি, একবকম সাপ), চুকু (চুক্র = সিব্‌কা), দক্‌সিনা (= দক্ষিণ দিক্), দেন্দা (= দণ্ড, জবিমানা), গেন্তা (= ঘণ্টা), হাব্‌গা (= অর্ঘ্য, মূল্য), হাস্তা (= হস্ত, দৈর্ঘ্যেব পবিমাণ), জেন্তেবা (= যন্ত্র), জেল্‌মা (= জন্ম), কাবনা (= কাবণ), কের্জা (= কার্য্য), কোসা (= অঙ্কুশ), মাহা (= মহান্), মাংসা (= মাংস), মেলাতি (= মালতীফুল), নাদ্দি (= নাডী), নামা (= নাম), পাপা (= দবিদ্র, পাপ), পুতেবী (= পুত্রী, বাজকুমাবী), বাজা, রূপা (= রূপ), সাক্‌সী (= সাক্ষী), সাক্‌তি (= শক্তি, ঐশী শক্তি), সেগেবা (= শীঘ্র), সেম্পুর্‌না (= সম্পূর্ণ), সেমুআ (= সমূহ), সেঞ্জাতা (সংজাত = অস্ত্র), স্যুর্গা (= স্বর্গ), উপায়া (= উপায়, পথ), ইত্যাদি।

ইন্দোচীনেব মোন্ ও খ্মেব এবং বর্মী ও শ্যামী ভাষায় ঐ প্রকাব সংস্কৃত শব্দেব আধিক্য দেখা যায়। দ্বীপময় ভাবতেব মতন এ অঞ্চলেও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) ধর্ম ভাবতবর্ষেবই মত জনগণেব ধর্ম হইয়া দাঁড়াইযাছিল, বাজাবা সংস্কৃত নাম গ্রহণ কবিতেন, বাজাব অনুশাসন সংস্কৃতে হইত, দেশ ব্রাহ্মণের আদর্শে পরিচালিত হইত। মোন্ ও খ্মেব জাতি প্রথম ভাবতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ কবে, পবে বর্মী ও শ্যামীরা ইহাদেব নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়। মোন্ ও খ্মেব ভাষায় প্রচুব সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় সব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায়। প্রাচীন মোন ভাষা হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেব উদাহবণ দিতেছি ; আধুনিক মোন্ ভাষায় এগুলি

আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; যথা—'কাল' = 'কাল্' ; 'শাস্ত্র' = 'সাস্' ; 'আরাধনা' = 'রাধনা' , 'প্রতিসন্ধি' = 'পতিসন্' ; 'শীল' = 'সীল্' , 'ইন্দ্র' = 'ইন্' ; 'উদ্যান' = 'উদ্যা' , 'ব্রাহ্মণ' = 'বুংনঃ' , 'মনুষ্য' = 'মনিস্' , 'নারদ' = 'নার্' , 'ধর্ম্ম' = 'ধর্' , 'মানিক্য' = 'মণিক্' , 'রত্ন, রতন' = 'রৎ' , 'নগর' = 'নগির', আধুনিক মোন 'নাগোও' , 'দোষ' = 'দোস্' , 'অভিষেক' = 'বিসেক্' , 'শঙ্খ' = 'সং', ইত্যাদি । কম্বোজের খ্মের ভাষার সংস্কৃত শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত, যথা , 'ইন্দ্র' = 'ইন্, এইন্', 'গর্ভ' = 'কের্', 'অঙ্গ' = 'অং', 'দেবতা' = 'তেপ্ দা', 'পুরুষ' = প্রোস্', 'বংশ' = 'বং', 'লোভ' = 'লোপ্', 'শাসন্ (ধর্ম-অর্থে)' = 'সাস্', 'স্বর্গ' = 'স্বর্', 'বাক্' = 'পেআক্'' 'নগর' = 'অঙ্কর', 'কাব্য' = 'কাপ্', 'শ্বেতচ্ছত্র' = 'স্বেতছৎ', পালি 'অস্সম' (আশ্রম) = 'অসম্', ইত্যাদি ।

শ্যামী বা থাই জাতির লোকেরা বৌদ্ধ, জাপানীদের হাতে যাওয়ার পূর্বে সেদিন পর্য্যন্ত ইহারা স্বাধীন ছিল । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ভ্রমণ-কালে সেখানকার একজন রাজপুরুষ আমায় বলিয়াছিলেন—'জাতিতে বা রক্তে আমরা চীনাদের জ্ঞাতি, কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় আমরা ভারতীয় ।' শ্যাম-রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে এখনও ভারতের ছাপ, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট । কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যেও তাই । ভৌগোলিক নাম বর্মা হইতে কাম্বোদিয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে গৃহীত । বর্মী ও শ্যামী এবং মোন্ ও খ্মের ভাষায় এখনও উচ্চভাবের শব্দ সমস্তই প্রায় সংস্কৃত ও ক্বচিৎ পালি হইতে লওয়া হয় । বর্মীদের প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম 'সূর্য্য' (পালি 'সুরিয়', বর্মী উচ্চারণে 'থুয়িয়া') , জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের 'গালোন্' অর্থাৎ 'গরুড' নামে অভিহিত করে । শ্যামী বা থাই জাতির রাজাদের নাম সংস্কৃত , 'আনন্দ মহীদল', 'প্রজাধিপক', 'বজ্রায়ুধ', 'চূড়ালঙ্করণ', 'মহামুকুট' , রাজবংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ । রাজ্যের নানা

বিভাগেব পদবী সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত—'বথচাবণপ্রত্যক্ষ' (=বেল-বিভাগেব ট্রাফিক্-সুপাবিন্টেণ্ডেণ্ট্), 'বাবিসীমাধ্যক্ষ' (=জলসেচ-বিভাগেব পবিদর্শক), 'বিজিতবাজভৃত্যাধিকার' (বাজাব খাস বিভাগেব কর্মচাবীব খেতাব)। সাধাবণ বহু বস্তুব নামও সংস্কৃত—'আকাশযান' (উচ্চাবণে 'আগাৎ-ছান্') =বিমান বা হাওযাই জাহাজ, 'দূবশব্দ' (উচ্চাবণে 'থোবো-সাপ্')=টেলিফোন, 'শতাংশ' (উচ্চাবণে 'সিতাঙ্') ='সেণ্ট' নামে মুদ্রা, টিকল্ বা বাৎ অর্থাৎ শ্যামী টাকাব শতভাগেব এক ভাগ। এই-সব সংস্কৃত শব্দ উচ্চাবণ-বিকৃতিব জন্য কানে শুনিয়া ধবা মুশ্কিল হয়, কিন্তু শ্যামী বর্ণমালায লিখিত রূপ দেখিয়াই এগুলি কোন্ ভাষাব তাহা সহজে বুঝা যায়। 'স্ববণ্য-প্রদেশ'-কে 'আবাঞ্-পাথেৎ,' 'সমুদ্র-প্রাকাব'-কে 'সমুৎ-বাখান', 'ব্রজপুবী'-কে 'ফেচাবুবী', 'বাজপুবী'-কে 'বাৎবুবী' রূপে উচ্চাবণ কবায, এই শব্দগুলিব স্বরূপকে লুপ্ত কবিয়া দেওযা হয়। শ্যামদেশে বিদেশী (ইউবোপীয়) পারিভাষিক শব্দাবলীর জন্য শ্যামী পণ্ডিতেবা সংস্কৃত হইতে নূতন কবিযা পাবিভাষিক শব্দ আবশ্যক-মত গঠন কবিয়া শ্যামী ভাষায় প্রয়োগ কবিতেছেন। এইরূপ কতকগুলি শব্দ আমাদেব দ্বাবায়ও বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতিতে গৃহীত হইতে পাবে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, 'এক শ্যামী বিদ্যার্থী' বচিত প্রবন্ধ, কলিকাতার 'বিশাল ভাবত' নামক হিন্দী পত্রিকাব ১৯৪১ সালেব জুন মাসেব সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়; পবে কাশীব 'নাগরী প্রচাবিণী সভা পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৯৯৮ সংবতের, ৪৬ খণ্ডেব দ্বিতীয় সংখ্যায়, এই প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছিল।

সিংহলের সিংহলী ভাষা আমাদেব বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারাঠীব মতই আর্য্যভাষা, ইহাতে বরাববই ভারতীয় সংস্কৃত ও পালি এবং সংস্কৃতের প্রভাব অব্যাহত ছিল। সিংহলী ভাষাব উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ

সংস্কৃতের। প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার তোখারী ভাষা ও খোতনী ভাষা, সংস্কৃতের মত ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংস্কৃতের জ্ঞাতিই ছিল। এই দুইটীতে ভারতবর্ষীয় লিপি ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের আগমন সহজ ছিল। কিন্তু এগুলিতেও সংস্কৃত শব্দ, স্থানীয় উচ্চারণ-মত বিকৃত হইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে কয়েক শতক ধরিয়া উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের যে উচ্চারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে, খোতনী ও তোখারী ভাষায় বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরিবর্তনের ধারা বিচার করিয়া, আমরা কতকটা আভাস পাইতে পারি। খোতনের পূর্বে 'ক্রোরৈন' নামে একটী রাজ্য ছিল, এখানে, এবং খোতনে, উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আগত হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল, সেইজন্য তাহাদের ভাষা—উত্তর-পশ্চিমের প্রাকৃত—এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং খরোষ্ঠী বর্ণমালায় লিখিত রাজকীয় দলিল-পত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে এবং পরের কয়েক শতক ধরিয়া এই প্রাকৃত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তুর্কী-ভাষী লোকেদের প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ায় তোখারী, খোতনী এবং উত্তর-পশ্চিমীয় প্রাকৃত—এই তিনটী আর্য্য ভাষার বিলোপ ঘটে। এখন কেবল প্রাচীন নগর-সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত এই-সব ভাষায় লিখিত কাগজ-পত্রে ও লেখা-সমূহে প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ভাষার (বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের) প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়।

তিব্বত মধ্য-এশিয়ারই অংশ, কিন্তু তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষার সহিত সম্পৃক্ত, ইহা অনার্য্য ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা। তিব্বতীরা ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণ করায়, ইহাদের ভাষাতে সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় শব্দের প্রবর্তন সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু জ্ঞাতি চীনাদের প্রদর্শিত পথেই তিব্বতীরা চলিল; ইহারা সংস্কৃত শব্দ ও নাম গ্রহণ না করিয়া, চীনাদের মতন এই শব্দ ও

নাম-সমূহের তিব্বতী অনুবাদই ব্যবহার করিতে লাগিল। বড-বড এবং কঠিন-কঠিন সংস্কৃত বই, পূরাপূরি নিজেদের শব্দ দিয়া, একটীও সংস্কৃত শব্দ ধার না করিয়া, ইহারা অনুবাদ করিতে লাগিল। ভাব লইল, ভাষা লইল না। তিব্বতীদের মধ্যে সম্ভবতঃ মুখে-মুখে গান, গাথা বা গদ্য-কাব্য প্রচলিত ছিল, একটা জাতীয় সাহিত্য ও সুনির্দিষ্ট শব্দ-গঠন-রীতি তাহাদের ছিল। সেইজন্য হয় তো ইহারা বিদেশী সংস্কৃতের শব্দ ধার করা আবশ্যক মনে করে নাই। এই হেতু চীনাদের মত ইহাদের মধ্যেও ভারতীয় নাম-সমূহ অনুবাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। যেমন—'বুদ্ধ' এই নামটীকে ইহারা অনুবাদ করিল 'সঙ্‌স্‌-র্গ্যল্‌' অর্থাৎ 'জাগ্রত (= বুদ্ধ) রাজা' (আজ-কালকার উচ্চারণে 'সেঙ্‌-জে' রূপে এই শব্দটী বলা হয), 'প্রজ্ঞাপারমিতা' = 'শেস্‌-রব্‌-ফ-রোল্‌-তু' ; 'অমিতাভ' = 'ঽওদ্‌-দ্‌পগ্‌-মেদ্‌' (আজকালকার উচ্চারণে 'ও্য-প্যা-মে'), 'বিষ্ণু' = 'খ্যব্‌-জুগ্‌' , 'ভারত' = 'র্গ্য-গর' , 'সরস্বতী' = 'দ্‌ব্যঙ্‌স্‌-চন্‌-ম' , 'অবলোকিতেশ্বর' = 'স্প্যান্‌-রস্‌-গ্‌জিগ্‌স্‌' (আধুনিক = 'চেন্‌-রে-সি'), 'তারা' = 'স্‌গ্রোল্‌-ম' (= 'ডোল্‌-মা'), ইত্যাদি। কিন্তু এত করিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিলেও, 'র্গ্য-গর-স্কদ্‌' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার মোহে ইহারা বেশ পডিয়াছিল, তিব্বতীদের পূজা-পাঠে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয, এবং 'ওঁ মণি পদ্মে হূং' মন্ত্রটীকে তো তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বত্র এবং সর্বজন-কর্তৃক ব্যবহৃত জাতীয মন্ত্র বলা চলে।

মোঙ্গোল ও তুর্করাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে, তুর্করা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোঙ্গোলদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় ধর্ম বজায় আছে, তবে তাহারা তিব্বতীদের কাছ হইতে এই ধর্ম পায় বলিয়া, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা ভোট-ভাষা বা তিব্বতীর প্রভাবই বেশী। তুর্কীদের প্রাচীন ভাষাতে দুই-চারিটা মাত্র সংস্কৃত শব্দ ও নাম স্থান পাইয়াছিল, তাহারা তিব্বতীদের

ও চীনাদের মত শব্দ ধার-করার চেয়ে শব্দ সৃষ্টি-করার দিকেই বেশী ঝুঁকিত। তুর্কীদের ভাষাতে আগত দুইটী সংস্কৃত শব্দ পারস্য-দেশ ঘুরিয়া ফারসী শব্দ রূপেই ভারতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, একটী সংস্কৃতের 'ভগধর' শব্দ, 'ভাগ্যবান্' বা 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ও পরে 'বীরপুরুষ' অর্থে, তুর্কীতে ইহার 'বগদির', 'বগাদির' প্রভৃতি বিকার ঘটে, ও শেষে ঈরানে ইহা 'বহাদুর' শব্দে পরিণত হয়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ফারসী হইতে ইহাকে 'বাহাদুর' রূপে গ্রহণ করিয়াছি। আর একটী শব্দ হইতেছে 'ভিক্ষু' শব্দ; তুর্কী ও মোঙ্গোল ভাষায় ইহার একটী রূপ হয় 'বাকৃশী'। আগে নিরক্ষর যাযাবর তুর্কী ও মোঙ্গোলদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতেন, এবং গতিকে তাঁহারাই সরকারী হিসাব-পত্র রক্ষার জন্য (বিশেষতঃ ফৌজের কাজে) নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে শব্দটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গেল, 'হিসাব-নবীশ', এবং ফারসীতে ইহার বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল, 'সৈন্যদলের খাজাঞ্চী'। (ইংরেজী clerk অর্থাৎ কেরানী শব্দের উৎপত্তিও অনুরূপ—ইহা মূলে cleric অর্থাৎ 'সাধু বা সন্ন্যাসী' শব্দ হইতে।) ফারসীতে এই শব্দ 'বখ্শী' রূপে ধারণ করিল, এবং 'বখ্শী' হইতে আমাদের বাঙ্গালা পদবী 'বকৃশী' বা 'বক্সী'।

মধ্য- ও উত্তর-এশিয়ায় এবং পূর্ব- ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা দ্বীপময় ভারতে যে ভাবে সংস্কৃত ভাষা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইন্দোচীন, দ্বীপময় ভারত ও সিন্-কিয়াঙে যে ভাবে সংস্কৃত প্রায় দেব-ভাষায় পরিণত হয়াছিল, ঈরানে (পারস্যে) সে ভাবে সংস্কৃতের প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। সংস্কৃতের মাতৃস্থানীয়া ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ও পরে স্থানীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতে সংস্কৃতের

প্রতিষ্ঠার পরে, ভারতীয় আর্য্যদের নিকট জ্ঞাতি ঈরানীরা, Akhaimenes বা হখামনীষীয়-বংশের সম্রাট্‌দের সময়ে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা হইয়া বসে, রাজার ভাষা বলিয়া তাহাদের ভাষার প্রভাব, ভারতের ভাষা প্রাকৃতের উপরে কতকটা পড়িয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন পারসীকে বা অবেস্তার ভাষায় বিশেষ করিয়া পড়ে নাই।

তাহার পরে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয়—দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক-সম্রাট্‌ আলেক্সান্দরের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র স্থাপন করে, গ্রীক রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বাহ্লীকে এবং ঈরানে রাজত্ব করেন; তখন গ্রীক ভাষা ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে লেন-দেন চলিয়াছিল—কিছু-কিছু গ্রীক শব্দ আমাদের প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে আসে, এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ গ্রীকেও যায়। তবে গ্রীকদের কাছ থেকে, পশ্চিম হইতে আমদানী কতকগুলি জিনিসের নাম ছাড়া, জ্যোতিষের কতকগুলি শব্দ সংস্কৃতে আসিয়াছিল, কিন্তু ভারত হইতে পশ্চিমে রপ্তানী হইত এমন কতকগুলি বস্তুর নাম ছাড়া, কোনও দর্শন বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দ গ্রীকেরা সংস্কৃত হইতে লয় নাই। কস্তীর (=টিন, গ্রীকে 'কাস্‌সিতেরোস্‌'), মুষ্ক (=কস্তুরী, মৃগনাভি, গ্রীকে 'মোস্‌খোস্‌'), শর্করা (গ্রীকে 'সাক্‌খারোন্‌'=প্রাকৃত 'সক্করা'), তমালপত্র (গ্রীকে 'মালাবাথ্রোন্‌'), 'কটুকফল' (গ্রীক 'কাকওফুল্লোন্‌', প্রাকৃত 'কডুঅফল'), 'ব্রাহ্মণ' (গ্রীকে 'ব্রাখ্‌মানেস্‌') প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শর্করার দেশ, আখ হইতে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ার করা ভারতবর্ষই প্রথম আবিষ্কার করে, এবং পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভাষায় চিনি ও মিসরীর নাম ভারতের 'শর্করা' ও 'খণ্ড' এই দুইটী সংস্কৃত শব্দের বিকার হইতে জাত (যেমন ইংরেজী sugar-candy,

ফারসী 'শকর-কন্দ' = 'শর্করা-খণ্ড'); কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমরা ভারতের এই দুই নিজস্ব বস্তুকে বিদেশী বস্তু বলিয়া অভিহিত করি—'চিনি' অর্থে 'চীনদেশ-জাত বস্তু,—চীনী', এবং 'মিসরী' অর্থে 'মিসরদেশ-জাত'।

খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে ভারতের সঙ্গে ঈরানের ঘনিষ্ঠ যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ইহার পরে মুসলমান যুগে ফারসী বা আধুনিক পারসীক ভাষা, তুর্কী ও ঈরানী বিজেতার সরকারী ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ফারসীই নিজে উত্তর-ভারতের ভাষাসমূহের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে এবং তাহার পরে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষার শব্দ ফারসীতেও গৃহীত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্তুর নাম, যে-সব বস্তু ভারতের পশ্চিমে রপ্তানী হইত। ফারসীতে নীত এইরূপ ভারতীয় অথবা সংস্কৃত শব্দের নমুনা—'শকর্' = শর্করা, 'কির্বাস্' = কার্পাস, 'বুৎ' = মূর্তি, 'বুদ্ধ'-মূর্তি, 'নারগীল' (নারিকেল), 'শমন্' (শ্রমণ, বৌদ্ধ পুরোহিত), 'বরহ্মন্' (ব্রাহ্মণ), 'সমন্দর্' (সমুদ্র), 'চন্দন্', 'লক্' (= লাক্ষা, গালা), 'নীল্', 'বব্র্' (= ব্যাঘ্র), 'শত্রঞ্জ্, চত্রঙ্গ্' (= চতুরঙ্গ), 'শাঘল্' (= শৃগাল), 'রায়্' (= প্রাকৃত রাঅ, রায = রাজা), ইত্যাদি। আবার এইরূপ শব্দ দুই-চারিটা আরবীতেও গিয়া পহুঁছিয়াছে, যেমন 'নার্জীল' (= ফারসী নার্গীল্ = নারিকেল), 'শকর' (= শর্করা), 'কাফূর' (= কর্পূর), 'সন্দল' (= চন্দন), 'মিস্ক' (= মুষ্ক, মৃগনাভি), 'জন্জাবীল' (= আদা, সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের'), ইত্যাদি। গণিতে ও জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতবর্ষ মধ্য-যুগের ঈরান ও আরবের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু যদিও ভারতীয় (সংস্কৃত) পুস্তক-সমূহ পহ্লবী ও আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, ভারতীয় শব্দ তেমন পহ্লবী ও আরবীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কচিৎ ভারতীয় নাম বিকৃত

অবস্থায় আরবী ও ফারসীতে স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য বটে, যেমন 'করটক-দমনক', পহ্লবীতে 'কললগ্-দমনগ্', আরবীতে 'কলিলহ্-দিম্নহ্', 'বিদ্যাপতি' (প্রাকৃত বিজ্জাপই) = 'বিদ্পয়্, বিদবয়্', 'সিদ্ধান্ত' = 'সিন্দ্হিন্দ', 'চরক' = 'স্বনক', ইত্যাদি। মুসলমান ধর্মের গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সুফী সাধকগণের সাধনা, দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুফী মতবাদের উৎপত্তিতে একদিকে যেমন আরবের 'তৌহীদ' অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর সাধনা ভিত্তি-স্বরূপ ছিল, তেমনি অন্য দিকে গ্রীসের দার্শনিক প্লাতোন্-এর চিন্তা ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনীয়দের মতবাদ ইহার মধ্যে দার্শনিকতা আনিয়া দেয়, এবং ইহার বিশিষ্ট কথা, Panthe-ism বা সর্বভূতে-ব্রহ্ম-বাদ, বিশ্বপ্রপঞ্চ-মধ্যে ব্রহ্মসত্তা সদা ক্রীড়মাণ, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম মূলে এক, বিশ্বসৃষ্টি পরব্রহ্মের লীলা মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি, ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দান, অথবা ব্রাহ্মণ্য চিন্তার বেদান্তের প্রভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুরঞ্জিত। কিন্তু এই-সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) ভারত হইতে সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পরে প্রসারিত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী ভাষাতে গৃহীত হয় নাই। আরবী ভাষা বাহিরের শব্দ সিরীয়, ফারসী (পহ্লবী) ও যূনানী (গ্রীক) হইতে প্রচুর পরিমাণে লইয়াছে; কিন্তু মাঝে ফারসীর ব্যবধান থাকায়, সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি আরবীতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, আর ফারসী তখন সম্পূর্ণ-রূপে আরবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রসাদোপজীবী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মধ্য-যুগে, ভারতের পশ্চিমে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন অল্প-বিস্তর প্রসৃত হইলেও, ভারতের ভাষা সংস্কৃত সেরূপে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; আরবী ও ফারসীর পৃষ্ঠপোষক মুসলমান তুর্কী ও ঈরানীদের ভারত-বিজয়ের ফলে, সংস্কৃত ভাষা, বিজিত, মূর্তিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু জাতির

ভাষা বলিয়া, ঈবানী তুর্কী ও আববের কাছে আব তাহার যোগ্য সমাদর পায় নাই। (অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ অল্-বীরূনীব মত দুই-চাবিজন উদাব-হৃদয় পণ্ডিতেব কথা আলাদা।) এই হেতু, পূর্ব-এশিয়াব মত পশ্চিম-এশিয়ায় সংস্কৃতেব জয়জযকাব ঘটিতে পাবে নাই।

এইরূপে তিন হাজাব বৎসব ধবিয়া সংস্কৃতেব গতি এশিয়া-খণ্ডে চলিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ সভ্যতাব ভাষা হিসাবে, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তাব ভাষা হিসাবে, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশের ভাষা হিসাবে, পৃথিবীতে তিনটী ভাষাব স্থান আছে—সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা। আববী মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক দৃষ্টি ও চিন্তাব বাহন, আববীতে নিহিত আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশ, জগতে নূতন বস্তু ছিল না। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষা সভ্যতাব ও সচ্চিন্তাব পোষণে সহায়তা কবিয়াছে; ও ইহাতে ভাবতেব মর্য্যাদাব্ বৃদ্ধি কবিয়াছে। সংস্কৃত পড়িতে আবম্ভ কবিয়া চীনাবা নিজ ভাষাব উচ্চাবণ সম্বন্ধে গবেষণা আবম্ভ কবিয়া দেয়, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে, সংস্কৃতেব বর্ণমালা দেখিযা কোবিয়ান ও জাপানীরা নিজেদেব ভাষাব জন্য ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালাব উদ্ভাবন কবে। সংস্কৃতেব সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতীয় বর্ণমালা মধ্য-এশিযায়, ইন্দোচীনে ও দ্বীপময় ভারতে বহু জাতি কর্তৃক গৃহীত হয়।

আজকাল নূতন কবিযা ইউবোপে এবং অন্যত্র সংস্কৃতেব ও সংস্কৃত বিদ্যা, সংস্কৃত চিন্তাব আলোচনাব ফলে, সংস্কৃত দার্শনিক ও অন্যবিধ শব্দ এখন বিশ্বমানবেব ভাষার সাধারণ ভাণ্ডারে উপনীত হইতেছে। আধুনিক কালে ইউবোপে সংস্কৃত ভাষাব চর্চার প্রথম ফল—আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর্য্য জাতিব পরিকল্পনা। 'গুণ, বৃদ্ধি, স্ববভক্তি, সন্ধি, সমাস, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ' প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাকরণেব শব্দ এখন আন্তর্জাতিক হইয়া গিযাছে। রুষ বসায়নবিৎ Mendelyef মেন্দেল্যেফ তাঁহার

আবিষ্কৃত Periodic Law বা 'পর্য্যায়-সূত্র' নামক বিশেষ সূত্রে সংস্কৃতের 'এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ' প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। 'ধর্ম', 'কর্ম', 'সংসার', 'অহিংসা', 'বুদ্ধ', 'নির্বাণ', 'বোধি', 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মন্', 'শিব', 'নটরাজ', 'শক্তি', 'অবতার', 'আত্মন্', 'স্বরাজ', 'স্বস্তিক,' 'স্বদেশী', 'মহাযান', 'হীনযান', 'বেদ', 'বেদান্ত', 'উপনিষদ্' প্রভৃতি শব্দ, পৃথিবীর সর্ব-জাতির শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত হইতেছে। সেদিন একখানি জাপানী 'নূতন শব্দের অভিধানে' (A Dictionary of New Terms)-এ আমাদের 'স্বরাজ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ, বন্দে-মাতরম্' শব্দগুলিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। এ-সমস্ত শব্দ আজকাল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মারফৎ বিশ্বজনের সমক্ষে গিয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ ছাড়া, ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) অপর বহু বহু শব্দ গত ৪৫০ বৎসর ধরিয়া, পোর্তুগীস ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের মারফৎ ইউরোপে নীত হইয়াছে, সেগুলির বিষয় এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য নহে॥

[কার্ত্তিক ১৩৫০]

দ্রাবিড়

'দ্রাবিড়' শব্দটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—[১] সঙ্কুচিত অর্থে, 'দ্রাবিড়' (বা 'দ্রবিড়' অথবা 'দ্রমিড') শব্দ 'তমিল্'-শব্দ-বাচ্য, এই অর্থে উহা কেবল দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের তমিল ভাষা ও তমিল জাতিকে বুঝাইয়া থাকে, আর [২] প্রসারিত অর্থে, 'দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড)' শব্দ দ্বারা দক্ষিণ- ও মধ্য- এবং পশ্চিম-ভারতে অবস্থিত একটী বিশাল ভাষা-গোষ্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা-সমূহ যাহারা বলে, তাহাদের বুঝায়। সংস্কৃত সাহিত্যে 'দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড)' শব্দ সঙ্কুচিত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়—দক্ষিণ-ভারতের চারিটী সুসভ্য দ্রাবিড়-ভাষী জাতি, তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালী, সংস্কৃতে যথাক্রমে 'অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কেরল' নামে পরিচিত। সংস্কৃতে 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' বলিলে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পাঁচটী আর্য্য ও অনার্য্য ভাষী বড়-বড় জাতিকে বুঝায়—দ্রাবিড় বা তমিল-মালয়ালী, অন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র। এই 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' শব্দ, উত্তর-ভারতের 'পঞ্চ-গৌড়' শব্দের যেন দক্ষিণী প্রতিরূপ। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে, পৃথিবীর আর সমস্ত ভাষাগুলির মত এই ভাষাগুলিও দেবভাষা সংস্কৃতের বিকারে জাত, 'দ্রাবিড়' বলিয়া, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর কল্পনা তাঁহাদের মনে আসে নাই। এখনও দ্রাবিড়-দেশে তেলুগু-কানাড়ী-তমিল-মালয়ালম্ প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী পণ্ডিত দুইচারিজন মনে করেন যে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন একটী দক্ষিণ-ভারতীয় সুপ্রাচীন যুগের প্রাকৃত হইতেই দ্রাবিড় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। এই মত প্রমাণের জন্য ইংরেজীতে ইঁহারা পুস্তক-প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মত গ্রহণ করেন নাই।

সংস্কৃত, প্রাচীন-ঈবানীয়, গ্রীক, লাতীন, গথিক্, প্রাচীন-আইবিশ, হিত্তী, প্রাচীন-শ্লাব, প্রভৃতি ভাষাব তুলনা-মূলক আলোচনা কবিয়া, ইউবোপীয় পণ্ডিতেরা আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যাব পত্তন কবিলেন। আদিম বা মূল আর্য্য ভাষাব প্রকৃতি ও রূপ তাঁহাদেব হাতে ধীবে ধীবে সুনির্ধাবিত হইল। বিভিন্ন ভাষাব প্রকৃতি-গত ঐক্য বা সাম্য অথবা অনৈক্য বা বৈষম্য বিচাব কবিয়া, পৃথিবীব তাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাকে কতকগুলি পৃথক্-পৃথক্ ভাষা-গোষ্ঠীতে বা ভাষা-গোত্রে বিভক্ত কবাব আবশ্যকতা স্বীকৃত হইল। কতকগুলি বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে পৃথিবীব সমস্ত ভাষাব বর্গীকবণেব চেষ্টা হইল। ইহাব ফলে, ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য, শেমীয়, হামীয়, ও তৎসঙ্গে উবাল-আল্তাই, ভোট-চীন, শুদ্ধ-নিগ্রো, বাণ্টু-নিগ্রো প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা-গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। বিগত খ্রীষ্টীয় উনিশেব শতকেব মাঝামাঝি, ভাবতবর্ষেব দ্রাবিড ভাষাগোষ্ঠী ও সুনির্ধাবিত হইল—Dravidian বা 'দ্রাবিড়' শব্দটী তখন ভাবতেব একটী বিশিষ্ট শ্রেণীব ভাষাবলীব নাম হিসাবে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ ববার্ট কাল্ড্ওয়েল তাঁহাব সুবিখ্যাত 'দ্রাবিড ভাষাবলীর তুলনা-মূলক ব্যাকবণ' পুস্তক প্রকাশিত কবিলেন, ইহাতে দ্রাবিড় ভাষাতত্ত্ব বিশিষ্ট রূপ লইয়া দেখা দিল।

তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বেব আলোচনাব ফলে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, আদি আর্য্য ভাষা সুপ্রাচীন কালে ভারতের বাহিরে কোনও দেশে কথিত হইত,—যদিও সেটী কোন্ দেশ, এবং সেই কাল কত প্রাচীন, তাহা অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশের মত এই যে, 'মধ্য বা পূর্ব' ইউরোপের কোনও অংশে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ বর্ষেব দিকে, এই আদি-আর্য্য-ভাষা

প্রতিষ্ঠিত ছিল,—এবং পরে আর্য্য-ভাষী জনগণ তাহাদের আদিম পিতৃভূমি হইতে প্রসৃত হইয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে এবং পশ্চিমে এশিয়ায় গমন করে, এশিয়ার-মাইনর হইয়া ঈরান ও ভারতবর্ষে আগমন করে। প্রথমটা ইউরোপের ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, মধ্য-এশিয়া-ই ছিল আদিম আর্য্যদের পিতৃভূমি, সেখান হইতেই ঈরান ও ভারতে এবং পশ্চিমে ইউরোপের নানা দেশে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। তখনকার দিনে, অর্থাৎ এখন হইতে ৮০।১০০ বৎসর পূর্বে, যখন এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন, মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে খবর বেশী জানা না থাকায়, সেদেশ লইয়া নানা কল্পনা চলিত, কিন্তু এখন নানা নূতন তথ্যের আবিষ্কারের ফলে, মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে অনেকেই আর আস্থাবান্ নহেন; পৃথিবীর অন্য কোনও অংশকেই আর্য্য পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিবার সঙ্গততর কারণ দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, আগেকার জ্ঞান-গোচর এবং কল্পনা-মতে, মধ্য-এশিয়া হইতে আর্য্যেরা ভারতে আসিল; তাহারা সুসভ্য শ্বেতকায় জাতি, উচ্চ সভ্যতা ও মনোভাব লইয়া, ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া এদেশে রাজা হইয়া বসিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদের অনায়াসেই নিজেদের অধীন করিয়া লইল; অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্য প্রভুদের দাসত্ব স্বীকার করিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণের লোকেরা আর্য্য-বংশ-জ, আর বিজিত অনার্য্যেরা হইল শূদ্র। হিন্দু সভ্যতা মুখ্যতঃ বৈদিক আর্য্যদেরই সৃষ্টি, হিন্দু জাতির মধ্যে যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সাধু, সৎ, ও শাশ্বত তাহার প্রায় সমস্তই আর্য্যজাতির দান, এবং যাহা-কিছু নিকৃষ্ট, কুৎসিত, অসাধু, অসৎ ও ক্ষণস্থায়ী, তাহার সবটাই অনার্য্য-মনোভাব-জাত। আধুনিক কালে যেভাবে আর্য্যভাষী শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়া, সেই-সব দেশের লোকেদের উপরে আধিপত্য

বিস্তার করিয়া তাহাদের নিজ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত করে, সেই ভাবেই তাহাদের এবং ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেদের আদি-পুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণ বিভিন্ন স্থানে অনার্য্যদের উপরে অধিকার এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ সহজেই এইরূপ মতবাদ মানিয়া লয়—ইহাতে প্রবল ইউরোপীয়গণের সহিত দূর-গত স্বাজাত্য-বোধ-জনিত একটু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদ হয় তো বিদ্যমান ছিল, সে আত্মপ্রসাদটুকু স্পষ্টতঃ স্বীকার করাও হয় তো লজ্জার বিষয় ছিল। যাহা হউক, এইভাবে বিজিত অনার্য্য জাতির সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অপকর্ষ এবং বিজেতা আর্য্য জাতির সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ একরকম মানিয়া লওয়াই হইল। যে-সকল অনার্য্য আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহারা বিতাড়িত হইয়া পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চল আশ্রয় করিল,—এখনও সেখানে তাহাদের বংশধরেরা কোল ভীল সাওঁতাল ওরাওঁ গোঁড় প্রভৃতি জাতি রূপে, আর্য্যদের বংশধরদের তুলনায় নিতান্ত অসভ্য অবস্থায়, জীবন-যাপন করিতেছে।

কিন্তু উপরে বর্ণিত এই মতবাদ এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। ভারতে আজকাল চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই চারিটী ভাষাবর্গ এদেশে বিদ্যমান। [১] Austric অস্ট্রিক গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] ভোট-চীন গোষ্ঠী, ও [৪] আর্য্য গোষ্ঠী। [১] অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অধীনে আসে—বর্মার মোন বা তালৈঙ, এবং পালৌঙ, ওয়া প্রভৃতি দুই চারিটী ভাষা; আসামের খাসিয়া, আর ভারতের কোল (বা মুণ্ডা) শ্রেণীর ভাষাবলী—সাওঁতালী, মুণ্ডারী, হো, কোরওয়া, খাড়িয়া, কুরকু, জুয়াঙ্, শবর। অস্ট্রিক-ভাষী জাতি এই শ্রেণীর ভাষা লইয়া, এক মতে উত্তর-ইন্দো-চীন হইতে আসামের পথ দিয়া, অন্য মতে

ভারতেব পশ্চিম হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভাবতে প্রবেশ কবে ; ভারতেব অস্টিক ভাষাবলীর সমশ্রেণিক বা জ্ঞাতি-স্বরূপ ভাষা ভাবতেব বাহিবে বলা হয়—কম্বোজেব খ্মেব, মালাই যবদ্বীপীয় প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতেব ভাষা, এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় দ্বীপাবলীব ভাষা-সমূহ। [২] দ্রাবিড গোষ্ঠী লইযা পরে আলোচনা কবা যাইবে। [৩] ভোট-চীন গোষ্ঠীব ভাষা—হিমালয়েব সানুদেশে—কাশ্মীবে, নেপালে, আসামে এবং ভাবত-ব্রহ্ম সীমান্তে ও ব্রহ্মদেশে কথিত হয়। [৪] আর্য্য ভাষাবলী—প্রাচীন আর্য্য-জাতিব ভাষা (বৈদিক যুগেব কথিত ভাষা) হইতে উৎপন্ন হিন্দুস্থানী বাঙ্গালা মাবাঠী পাঞ্জাবী সিন্ধী গুজবাটী প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলি এখন প্রায় সমগ্র উত্তব-ভাবতে ও দাক্ষিণাত্যেব কতক অংশে প্রচলিত। এক সময়ে, আর্য্য-ভাষাব আগমনেব পূবে, সমগ্র উত্তব-ভাবতে অস্ট্রিক ও ও দ্রাবিড ভাষা প্রচলিত ছিল ; আর্য্য-ভাষা আসিযা এগুলিকে বিতাডিত অথবা কোণ-ঠেসা কবিয়াছে।

অস্ট্রিক (কোল বা মুণ্ডা), দ্রাবিড, ও ভোট-চীন—এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীব অনার্য্য এক দিকে, আর আর্য্য ভাষা আব এক দিকে। শেষটা উত্তর-ভাবতে জয় হইল আর্য্য ভাষার, অনেকটা আর্য্যদেবই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেব ফলে। দক্ষিণ-ভারতে কিন্তু দ্রাবিড-গোষ্ঠীব অনার্য্য ভাষাগুলি, আর্য্য ভাষাব নিকট সম্পূর্ণ রূপে পবাভূত হয় নাই, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের আর্য্যভাষাব দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, তেলুগু কানাডী তমিল মালয়ালম্ এখনও মাথা খাডা কবিয়া দাঁডাইয়া আছে—ভারতবর্ষেব প্রায এক পঞ্চমাংশ লোক এখনও দ্রাবিড-জাতীয় অনার্য্য ভাষা বলিয়া থাকে।

অনুমান হয়, উত্তব-ভারতে—গঙ্গাতটে, বাঙ্গালা দেশে, উডিষ্যায়, এবং অনেকটা মধ্য-ভারতে—অস্টিক-ভাষী লোকেদেবই বসবাস বেশী করিয়া

ছিল। দ্রাবিড়-জাতীয় লোকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। দক্ষিণ ভারতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য এখনও বজায় আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাঙ্গালা দেশে ও উড়িষ্যাতেও দ্রাবিড়েরা ছিল বলিয়া অনুমান হয়, তবে বোধ হয়, সংখ্যায় ইহারা অস্ট্রিকদের মত এত প্রবল ছিল না। ভোট-চীন-ভাষী লোকেরা সর্বশেষে ভারতে আগমন করে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে ভারতের সীমান্তে ইহাদের আগমন ঘটে। ক্রমে হিমালয়ের এপারে নেপালে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গে এবং আসামে ইহাদের উপনিবেশ হয়। উত্তর-বঙ্গের জনগণের মধ্যে ইহাদের অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে, অন্যত্র নেপালে, ভোটানে, আসামে—বহুস্থানে ইহাদের পৃথক্ সত্তা এখনও বিদ্যমান। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন, আর্য্য—এই চারিটী ভাষা-গোষ্ঠীই ভারতে প্রচলিত।

সম্প্রতি Vilmos Hevesy ভিল্‌মোশ্‌ হেভেশি (ইংরেজীতে William Hevesy) নামে জনৈক হঙ্গেরীয় বিদ্বান্ এই চারিটী ছাড়া আর একটী—অর্থাৎ পঞ্চম একটী—ভাষা-গোষ্ঠীর ভারতে আগমনের এবং প্রতিষ্ঠিত হওনের সম্ভাব্যতা অনুমান করিয়াছেন। ইঁহার মতে, উরাল-আল্‌তাই শ্রেণীর একটী ভাষা (এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, একদিকে তুর্কী, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, অন্যদিকে মজর Magyar মজর বা হঙ্গেরীয়, ফিন্‌লাণ্ডের Finn ফিন্, এস্তোনিয়ার Est এস্ত্, লাপ্‌লাণ্ডের Lapp লাপ্, এবং রুষদেশে প্রচলিত কতকগুলি ভাষা, Ostyak ওস্ত্যাক্, Vogul ভোগুল্, Chermes চের্মেস্ প্রভৃতি) প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে আনীত হয়; এবং কোল (বা মুণ্ডা) শ্রেণীর ভাষাগুলি হইতেছে এই উরাল-আল্‌তাই গোষ্ঠীরই একটী শাখার অন্তর্ভুক্ত—খাসিয়া, মোন্, খ্‌মের, মালাই প্রভৃতির সহিত সম্পৃক্ত নহে। অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠী হইতে এগুলিকে হেভেশি বিচ্ছিন্ন করিয়া

লইতে চাহেন। হেভেশি যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে-সমস্ত যুক্তি এখনও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা হয় নাই, বিচার-সহ হইলে, সে-সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সহিত উত্তর-এশিয়ার একটা জাতি-গত ও ভাষা-গত যোগ-সূত্র প্রমাণিত হইবে।

যাহা হউক, প্রাচীন যুগের, আর্য্যদের আগমনের সময়ের, দ্রাবিড়-জাতির সম্বন্ধে আমাদের খবর পাইবার উপায় কি? এই জাতি কোথা হইতে আসিল? আচারে ব্যবহারে, সংস্কৃতিতে, ইহারা প্রাচীন কালে কি অবস্থায় ছিল? ভারতের সভ্যতায়, হিন্দু সংস্কৃতির গঠনে, ইহাদের আহৃত উপাদান কি? এতাবৎ—বর্তমান বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত—প্রাচীন দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র উপায় ছিল, দ্রাবিড় ভাষাগুলি। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলি এক দিকে, অস্ট্রিক ভাষাগুলি এবং ভোট-চীন ভাষাগুলি এক এক দিকে, এবং দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর এক দিকে। আর্য্য, অস্ট্রিক (কোল, মুণ্ডা), ভোট-চীন—এগুলি হইতে দ্রাবিড়ের মৌলিক পার্থক্য দেখিয়া, দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড়-ভাষী মূল জাতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ স্থান দিতে হয়। বেলুচিস্থানে, ঈরানীয় আর্য্য-ভাষী বেলুচ ও পাঠান এবং ভারতীয় আর্য্য সিন্ধী-ভাষীদের মধ্যে ব্রাহুই-জাতি বাস করে; ইহাদের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে, আর্য্য ভাষার প্রসারের পূর্বে, বেলুচিস্থানে ও সন্নিকটস্থ সিন্ধু প্রদেশেও, ব্রাহুইয়ের মত দ্রাবিড় ভাষা চলিত। মহারাষ্ট্র-দেশে মারাঠী আজকাল প্রচলিত,—মারাঠী সংস্কৃত-জাত আর্য্যভাষা; কিন্তু মহারাষ্ট্র-দেশের অনেকটা জুড়িয়া কানাড়ীর মত দ্রাবিড় ভাষা যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি কারণে এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হইবে যে, এক সময়ে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত—এবং মধ্য-ভারতের অনেকটাও—

দ্রাবিড-ভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। বৈদিক যুগে (খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের দ্বিতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে) উত্তর ভারতে যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক-ভাষী অনার্য্যদেরই সঙ্গে আর্য্যদের সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ ঘটে, তাহা বেদের ভাষায় দ্রাবিড় ও কোল হইতে হইতে গৃহীত কতকগুলি শব্দ হইতে অনুমিত হয়। এইরূপ দ্রাবিড-মূল বৈদিক শব্দের উদাহরণ, যথা,—'অণু, অবণি, কপি, কর্মার, কলা, কাল, কিতব, কুট, কুণার, গণ, নানা, নীল, পুষ্প, পুষ্কর, পূজন, ফল, বিল, বীজ, রাত্রি, সায়ম্, অটবী, আডম্বর, খড়্গ, তণ্ডুল, মটচী, বলক্ষ, বল্লী।' আর্য্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির উদ্ভব ও প্রসার, প্রাচীনকালে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব হইতে জাত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ দুই চারিটী অনুমান-মাত্র আমাদের সম্বল ছিল। আর্য্য-ভাষায় রচিত বৈদিক সাহিত্য সুপ্রাচীন,—অন্ততঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের গোড়ায় এই সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থ-নিবন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় রচিত কোনও সাহিত্যের অত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমাদের আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির (বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী প্রভৃতির) একমাত্র মূল-স্থানীয় বৈদিক ভাষা আমরা পাইয়াছি, তাহার ও পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃতের এবং প্রাকৃতের সাহায্যে আমরা এই-সকল আধুনিক ভারতীয় ভাষার উৎপত্তির কথা ও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু তমিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলির মূল-স্বরূপ একটী সুপ্রাচীন *'আদি দ্রাবিড়' ভাষার কোনও নিদর্শন নাই।

আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমরা বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষার পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র কতটা নিকট বা কতটা দূর, তাহার একটা আভাস পাইতেছি; নিম্নলিখিত রূপে এগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন,—অজ্ঞাত ও অধুনা-লুপ্ত আদি-দ্রাবিড় ভাষার

[১] দক্ষিণ-ভারতীয় শাখা—ইহা হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন তমিল ও প্রাচীন-কানাড়ী ; তুলু ; কোডগু বা কুর্গের ভাষা (প্রাচীন তামিল হইতে আধুনিক তমিল ও মালয়ালম্, এবং প্রাচীন-কানাড়ী হইতে আধুনিক-কানাড়ী ও তোডা এবং কোটা উদ্ভূত হইয়াছে); [২] মধ্য-ভারতীয় শাখা—ইহার মধ্যে পড়ে প্রাচীন ও আধুনিক তেলুগু ; কোলামী, কুই বা খন্দ, গোণ্ড ; এবং কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ, ও মাল্‌তো বা মাল-পাহাড়ী ; এবং [৩] পশ্চিম-ভারতীয় শাখা—বেলুচিস্থানের ব্রাহুই ইহার অন্তর্গত। কিন্তু অজ্ঞাত আদি-দ্রাবিড়ের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় নাই। তেলুগু, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালম্-এর লক্ষণীয় সাহিত্য আছে, কিন্তু এই-সব সাহিত্য খুব প্রাচীন নহে। তেলুগু সাহিত্যের বয়স এখন হইতে মাত্র ৯০০ বৎসর—সবচেয়ে প্রাচীন তেলুগু বই নন্নয়-কৃত মহাভারতের আংশিক অনুবাদ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের, কানাড়ী সাহিত্যের নিদর্শন কতকগুলি প্রাচীন অনুশাসনে পাওয়া যায়, এগুলির তারিখ খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিক্ হইতে আরম্ভ, ইহার পূর্বে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লিখিত ও মিসরে প্রাপ্ত একখানি গ্রীক নাটকের ছিন্ন পত্রে ভারতীয় ভাষা-বিশেষের নমুনা-রূপে কয়েক ছত্র প্রাচীন কানাড়ী গ্রীক অক্ষরে লিখিত পাওয়া গিয়াছে—ইহাই হইতেছে দ্রাবিড় ভাষার সব-চেয়ে পুরাতন সামসময়িক নিদর্শন, তমিল ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাচীন-তমিল সাহিত্যে পাওয়া যায়—এই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু আনুমানিক যীশু-খ্রীষ্টের ১০০।১৫০ বৎসর পরেকার সময়ের হইলেও, ইহাতে খ্রীষ্টাব্দ ৫০০-র পূর্বেকার ভাষা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া অনুমান হয় (খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা কতক-গুলি শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির ভাষার সম্পূর্ণ উদ্ধার এখনও হয় নাই, তবে মনে হয়, হয় তো সেগুলি প্রাচীন তমিলে লেখা ; এই অনুমান সত্য হইলে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে তমিল গিয়া পঁহুছে) ; মালয়ালী ভাষা

প্রাচীন-তমিলেব বিকাবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে উতভূ হয়। কাজেই, খ্রীষ্টাব্দেব প্রথম সহস্রকেব নিদর্শনেব মধ্যে নিবদ্ধ দ্রাবিড ভাষাবলী হইতে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রক বা দ্বিতীয় সহস্রকেব মূল দ্রাবিড ভাষাব বা সভ্যতাব ধাবণা কবা একটু কঠিন হইয়া পডে।

আর্য্যদেব আগমনেব পূর্বে এদেশে যে একটা উচ্চদবেব সভ্যতা গডিয়া উঠিয়াছিল, এতদিন ধবিযা আমাদেব সে বিষয়ে কোনও ধাবণা ছিল না। কতকগুলি পণ্ডিত কেবল এইটুকুই দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষাব অনেক শব্দ মূলে দ্রাবিড-ভাষা-জাত। Kittel কিটেল-এব বিখ্যাত কানাডী অভিধানেব ভূমিকায় এইরূপ ৪৫০ শব্দেব আলোচনা আছে। লোকেব মনে আলোচনা ও বিচাব দ্বারা ক্রমে এইরূপ ধাবণাও দাঁডাইতেছে যে, হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতাব অনেক উপাদান, যাহা বেদ-বিবোধী ও বৈদিক-জগতের বহির্ভূত, তাহা দ্রাবিডদেব নিকট হইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, যে ভাবে বিভিন্ন আর্য্যভাষাব শব্দাবলী লইয়া, সেগুলিকে আধাব কবিয়া, আর্য্য-ভাষী জাতির সভ্যতা, তাহাদেব ভৌগোলিক পাবিপার্শ্বিক প্রভৃতি নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধাবেব চেষ্টা হইযাছে, সেই ভাবে দ্রাবিড ভাষাগুলিব মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন বলিয়া যেটীকে মনে কবা হয়, সেই প্রাচীন তমিলেব্ল শুদ্ধ তমিল বা দ্রাবিড শব্দ ধবিয়া, কাল্ড্‌ওয়েল সাহেব আদি-দ্রাবিডদেব সভ্যতাব একটা চিত্র খাডা করিবাব চেষ্টা কবিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত এই আদি দ্রাবিড সভ্যতার কথা, আধাব-স্বরূপ শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দগুলিকে " " এইরূপ উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে দিয়া, ও একটু অদল-বদল কবিয়া নীচে দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা অক্ষবে লিখিত এই সব প্রাচীন তমিল শব্দেব দীর্ঘ-এ-কাব এবং দীর্ঘ-ও-কাবের জন্য 'এ' এবং 'ও' বর্ণ দ্বিত্ব কবিয়া দেওয়া হইতেছে, 'ব়'-এর উচ্চারণ w, ঝ-এর zh, (ঘোষবৎ 'ষ') এবং ল় হইতেছে মূর্ধন্য ল।

দ্রাবিড়দের "কো" বা "বেন্তন্" অথবা "মন্নন্" অর্থাৎ 'রাজা' থাকিতেন ; রাজারা "কোট্টৈ" বা "অরন্" অর্থাৎ 'সুরক্ষিত বাটী'তে বাস করিতেন, তাঁহারা "নাটু" অর্থাৎ 'প্রদেশের' উপর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের "পুল্লবন্" অর্থাৎ 'কবি' অথবা 'চারণ' থাকিতেন, "কোণ্টাট্টম্" অথবা "তিররিঝ" অর্থাৎ 'উৎসবের দিনে' কবিরা "চেয়্যুল্" অর্থাৎ 'কবিতা' গান করিতেন। দ্রাবিড়েরা "এঝুত্তু" অর্থাৎ 'লিখন' কার্য্যের সহিত পরিচিত ছিল, "ইরকু" অর্থাৎ 'লেখনী' দিয়া তালপত্রে তাহারা "বরৈ" অর্থাৎ 'লিখন-কার্য্য' করিত। কতকগুলি লিখিত তালপত্র দিয়া তাহারা "এটু" বা 'বই' তৈয়ারী করিত। নানা দেবতার পূজা তাহাদের মধ্যে থাকিলেও, তাহারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা এক ঈশ্বরেরও পূজা করিত—সেই ঈশ্বরের নাম ছিল "কো" বা 'রাজা', এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহারা "কো-ইল্" ("কোয়িল্" বা "কোবিল্") অর্থাৎ 'রাজপ্রাসাদ' বা 'মন্দির' বানাইত। তাহাদের মধ্যে লোক-ব্যবহার ও আইন-কানুন ("কট্টলৈ, পঝকম্") ছিল, কিন্তু বিচারপতির বা ব্যবহারজীবীর কথা পাওয়া যায় না। ধাতুর মধ্যে তাহারা "পোন্" বা 'সোনা', "বেল্ল্ব্বি" বা 'রূপা', "চেম্পু" বা 'তামা', এবং "ইরুম্পু" বা 'লোহা'র ব্যবহার জানিত, কিন্তু টিন, শীশা ও দস্তা তাহাদের জানা ছিল না। বুধ ও শনি ব্যতীত অন্ত দিনগুলির নামকরণ তাহারা করিয়াছিল ("বেল্ল্ব্বি" = 'শুক্র', "চেব্বয়্" = 'মঙ্গল', "বিয়াঝম্" = 'বৃহস্পতি')। তাহাদের "উর্" অর্থাৎ 'নগর' ছিল, "তোণী, ওটম্, বল্লম্" অর্থাৎ নানা প্রকারের 'নৌকা', এমন কি "কম্পল্" ও "পটবু" অর্থাৎ 'জাহাজ' করিয়া তাহারা সাগর-গমন করিত। কিন্তু প্রাচীনকালে তাহারা কোনও দ্বীপের সহিত পরিচিত হয় নাই, দ্বীপ-বাচক কোনও শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দ নাই—অতএব বুঝা যায় যে, তাহারা সুদূর দেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে নাই। কৃষি-কার্য্যে তাহারা বিশেষ

দক্ষ ছিল ("এএব্"='লাঙ্গল', "বেলন্মৈ='কৃষি')। এবং বিশেষ যুযুৎসু জাতিও তাহাবা ছিল, যুদ্ধে "বিল্" অর্থাৎ 'ধনু', "অম্পু" অর্থাৎ 'শব', "বেল্" অর্থাৎ 'বর্ষা', "বাল্" অর্থাৎ 'তরবাবী'—এই-সব অস্ত্র ব্যবহাব কবিত। সাধাবণ অনেকগুলি বৃত্তি তাহাদেব মধ্যে প্রচলিত ছিল, যথা—সূতা-কাটা, কাপড়-বোনা, কাপড বঙ-কবা, হাঁডীকুডী গডা প্রভৃতি। কাল্ড্‌ওয়েলেব পবে, তমিল ভাষাব আধাবে এই ধবণের অনুসন্ধান খুব খুঁটি-নাটিব সঙ্গে কবেন পবলোকগত অধ্যাপক P. T Srinivas Iyengar শ্রীনিবাসিয়েঙ্গব্; ইহাঁব বচিত Pre-Aryan Tamil Culture—Lectures delivered under the auspices of the University of Madras, 1930, এ সম্বন্ধে অতি উপযোগী ও মূল্যবান্ পুস্তক।

১৯২০ সালে যখন পরলোকগত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেন-জো-দড়োব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কাব কবিলেন, এবং তাহার পবে যখন দক্ষিণ-পাঞ্জাবেব হড়প্পায় ও সিন্ধুপ্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ও অন্যত্র এক বিরাট্ নাগবিক সভ্যতাব বহু নিদর্শন বাহিব হইতে লাগিল, তখন বিশেষজ্ঞগণ এই সভ্যতাকে বেদ-বর্ণিত জগৎ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্ দেখিযা, ভাবতের আর্য্য-পূর্ব যুগেব জাতিদেব সঙ্গে ইহাব সংযোগ অনুমান কবিতে লাগিলেন। আবাব ওদিকে দেখা গেল যে, প্রাচীন ঈবান ও মেসোপোতামিয়া, এমন কি এশিয়া মাইনব ও পূর্ব ভূমধ্য-সাগবেব Crete ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপেব প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষেব সহিত ভাবতেব এই প্রাচীন আর্য্য-পূর্ব কালের সভ্যতাব মিল বহিয়াছে। সুতবাং ভাবতেব যে আর্য্য-পূর্ব জাতি মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগবিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ভাবতেব পশ্চিমেব অধিবাসী জাতিদেব যোগ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হইল। ভাবতের এই আর্য্য-পূর্ব জাতি কোন্‌টী—অস্ট্রিক, না দ্রাবিড়, না ভোট-চীন?

নানা দিক্ দিয়া বিচার করিয়া মনে হয় যে, আদিম দ্রাবিড় জাতিই ভারতের সুপ্রাচীন যুগের, আর্য্যদের আসিবার পূর্বের কালের এই সভ্যতার স্রষ্টা ছিল, 'স্রষ্টা' জোর করিয়া বলিতে না পারি—তাহাদের মধ্যেই এই সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, এ কথা বলিতে পারি। দুই চারিজন নৃতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকের মতে, দ্রাবিড় জাতি ভারতে আসিয়াছিল পশ্চিম হইতে, সম্ভবতঃ পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে। দুই একটী ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য বিষয় আলোচনা করিয়া বর্তমান লেখকেরও সেইরূপ অনুমান হয়। কি করিয়া এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহার খুঁটি-নাটি ইতিহাস না বলিয়া, দ্রাবিড়দের উৎপত্তি ও আগমন সম্বন্ধে আমার অনুমান বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

খ্রীষ্ট-জন্মের ৩০০০ বৎসর আগে, পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে Crete ক্রীটে ও Lycia লিসিয়া (প্রাচীন গ্রীকে লুকিয়া) প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলের দেশে, আদি দ্রাবিড়দের অর্থাৎ আদি-দ্রাবিড়-ভাষীদের বাস ছিল। ইহাদের জাতীয় নাম ছিল সম্ভবতঃ *Drmil- '*দৃমিল্' অথবা *Drmmizh- 'দৃম্মিঝ্'-, পরবর্তী কালে লুকিয়া বা লিসিয়ার লোকেরা এই নাম Trmmili 'তৃম্মিলি' রূপে লিখিত, এবং খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতকে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতোস্ এই নাম Termilai 'তের্মিলাই' রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। এই জাতির লোকেরাই কোনও সময়ে, আর্য্যদের আগমনের বহু পূর্বে, ইরাক ঈরান ও বেলুচিস্থান আফগানিস্থান হইয়া, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হয়, এবং সেখান হইতে রাজপুতানা মহারাষ্ট্র হইয়া এই জাতি, ইহাদের ভাষা ও সভ্যতা লইয়া দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয়,—ইহারা গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও বাস করিতে থাকে। ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল হইতে ইহারা স্থানীয় নৌকা-গঠন-রীতি, স্থানীয় পুরুষ-প্রকৃতির পূজা (যাহা পরে ভারতবর্ষে শিব-উমার পূজামূলক পৌরাণিক ধর্মে পরিণত হয়)

প্রভৃতি লইয়া আসে। ভারতবর্ষে ইহাদের অন্যতম জাতীয় নাম সম্ভবতঃ প্রথমটায় *Dramizha-রূপে প্রচলিত হয়, আর্য্যেরা এই নাম সংস্কৃতে 'দ্রমিল' বা 'দ্রমিড' অথবা 'দ্রবিড' রূপে রূপান্তরিত করিয়া লয়। এই 'দ্রমিল' নাম পরে 'দমিলু' রূপে পরে আমরা পালি ও সিংহলী ভাষায় পাই (ইহা হইতে গ্রীকে Damirike = দমিল-দেশ), এবং খ্রীষ্ট-জন্মের পরেকার প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে এই নাম তমিল-ভাষায় Tamizh অথবা Tamil (তমিঝ্, তমিল্) রূপ গ্রহণ করে।

প্রাচীন ভারতে, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ইতিহাসে যেমন যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছিল, তেমনি মূল বা আদি-দ্রাবিড হইতে এবং তাহার পরেকার পরিবর্তিত দ্রাবিড় হইতে, বিভিন্ন যুগের আর্য্যভাষায়, দ্রাবিড শব্দ গৃহীত হইতেছিল , দ্রাবিড ভাষাতেও তেমনি সংস্কৃত বা আর্য্য শব্দ আসিতেছিল। দ্রাবিড হইতে আগত এইরূপ বহু শব্দের মধ্যে একটী শব্দ হইতেছে 'ঘোটক' বা 'ঘোট' শব্দ। আর্য্যেরা ঘোড়ার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু ভারতে আসিয়া তাহাদের নিজস্ব আর্য্য-ভাষার শব্দ 'অশ্ব' ক্রমে তাহাদের ভাষায় অপ্রচলিত হইল , দেশীয় অনার্য্য (দ্রাবিড়) শব্দ, 'ঘোটক' রূপে আর্য্য-ভাষায় গৃহীত হইল , এই 'ঘোটক' শব্দ এখন 'ঘোড়া, ঘোড়ো' প্রভৃতি রূপে সমস্ত আধুনিক বা নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় বিদ্যমান। অনুমান হয়, আদিম দ্রাবিড়ে এই শব্দের রূপ ছিল *'ঘুত্র' বা *'ঘোত্র', তাহা হইতে প্রাচীন কোনও প্রাকৃতে 'ঘোট' শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং এই 'ঘোট' শব্দ সংস্কৃতেও আসে। ওদিকে *'ঘোত্র' বা *'ঘুত্র' তমিলে এখন 'কুতিরৈ' রূপ ধারণ করিয়াছে, কানাড়ীতে 'কুদুরে,' ও তেলুগুতে 'গুর্রম'। ঘোটকের সঙ্গে দ্রাবিডদের কবে ও কোথায় পরিচয় হইয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই ; *"ঘুত্র" শব্দের প্রতিরূপ প্রাচীন মিসর-দেশেও htr রূপে পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা আদি-দ্রাবিড় ও আদি ভারতীয়-আর্যের সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণের ইতিহাসের, অর্থাৎ ভারতের সভ্যতার পত্তনের ও প্রাথমিক ইতিহাসের, সন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের সভ্যতার দ্রাবিড়ের আহৃত উপাদান আর্যের দানের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়॥

৬৫ পৃষ্ঠায় যে দ্রাবিড় শব্দগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি হইতেছে "চেন্-তমিঝ্" অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগের প্রাচীন তমিলের—আদি-দ্রমিড়ে এগুলির প্রতিরূপ কি ছিল তাহা নির্ধারিত হয় নাই। আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—
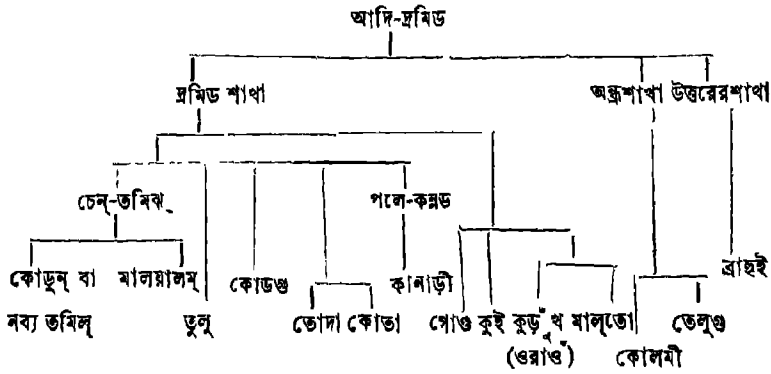
হিন্দু ধর্মের স্বরূপ

হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক্‌ সম্বন্ধে আমার মত শাস্ত্রহীন ভক্তিহীন প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির কিছু বলিবার নাই—জীবনে অনুভূতি ও উপলব্ধির অধিকারী যে ব্যক্তি হয় নাই, সে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে কি বলিবে ? আমি এই প্রবন্ধে হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বহিরঙ্গ ধরিয়া, হিন্দুর চিন্তা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা করিব মাত্র। হিন্দু ধর্মের ও চিন্তার প্রতিষ্ঠাভূমি কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়া, সেই সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। এখানে অধ্যয়ন, অবলোকন এবং বিচারের অবকাশ আছে, ঐতিহাসিক আলোচনা এখানে তথ্য-নির্ধারণে সহায়তা করিবে। বাহ্য দৃষ্টিতে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি, তাহা নিজ জ্ঞান-গোচর মত বলিবার চেষ্টা করিব।

যদি সূত্রাকারে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব গুলি বলিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলিকে নঞ্‌-মূলক ও সন্‌-মূলক রূপে, অর্থাৎ নাস্তি এবং অস্তি এই উভয় দিক্‌ দিয়া, ইহার নিম্ন-লিখিত সংজ্ঞাগুলি ধরিয়া দিতে পারা যায়। হিন্দু ধর্ম হইতেছে—[১] অ-ব্যক্তিবিশেষ-নিষ্ঠ, [২] বিশেষ-আপ্তমন্ত্র-নিষ্ঠতা-বিহীন, [৩] জ্ঞানানুভূতিলব্ধ-শশ্বাতসত্তা-নিষ্ঠ [৪] বিশ্বাত্মানুভূতি-মূলক; [৫] দুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাময়, এবং [৬] বিশ্বন্ধর।

এখন একে একে এই সমস্ত সংজ্ঞা বা লক্ষণ সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা যাউক্‌।

[১] হিন্দু ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য, ইহা অন্য কতকগুলি ধর্মের মত কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-কাহিনী অথবা জীবন-চরিত এবং তাঁহার

প্রচারিত মত-বাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত নহে। যেমন যীশু খ্রীষ্টকে বাদ দিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের অস্তিত্বের কল্পনাই করা যায় না, জরথুশ্‌ত্র ও বুদ্ধদেব ছাড়া জরথুশ্‌ত্রীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম যেমন হয় না, মোহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা যেমন ইস্‌লাম বা মোহম্মদীয় ধর্মের অন্যতর প্রধান প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ধর্মে সেরূপ কোনও একজন-মাত্র অবতার বা তত্ত্বজ্ঞ বা ধর্মগুরুর সর্বগ্রাহিতা নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে বিদ্যমান কোনও একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই অন্য ধর্মগুলি নিজ শাশ্বতত্ত্ব প্রচার করিতেছে। দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ মনুষ্য-চরিত্রের সীমার মধ্যে হিন্দু ধর্ম তাহার স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহে নাই। হিন্দু ধর্মকে প্রাচীন মিসর, আসিরিয়া-বাবিলন, প্রাচীন গ্রীস, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ধর্মের মত একটী Natural Religion বা 'স্বভাবজ ধর্ম' বলা যাইতে পারে, কারণ মানুষের অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল রাখিয়া এইরূপ ধর্মের বিকাশ হয়, এবং জীবনের নানামুখিতার মতই এইরূপ স্বভাব-জাত ধর্ম নানামুখ। এই সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মকে, যেগুলি কোনও বিশেষ আচার্য্যের শিক্ষাময় শাস্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, যেগুলি 'কেতাবী ধর্ম' নহে, যাহা বিশ্বপ্রপঞ্চের ও মানব-জীবনের পরিচালনাকারী কতকগুলি বিধি মানে, সেই ধর্মগুলিকে প্রাচীন কালে ইউরোপে খ্রীষ্টানরা Pagan অথবা 'জানপদ' ধর্ম বলিত। হিন্দু ধর্মও এইরূপ Pagan ধর্ম; ইহাই ইহার প্রধান গৌরবের কথা, ইহার সার্থকতা এখানেই। সমগ্র মানব-সমাজের গ্রহণের জন্য কল্পিত কতকগুলি বিশেষ মতবাদেই (হিন্দুধর্মের মতে) মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তি নহে। খ্রীষ্টান ধর্ম, মোহম্মদীয় ধর্ম প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম, এক-একটী বিশেষ প্রকারের সাধনাকে, এক-একটী বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধিকে, মোক্ষ-সাধনের একমাত্র ও অদ্বিতীয় মার্গ বা

উপায় বলিয়া মনে করে; এই শ্রেণীর ধর্ম অন্য সকল প্রকারের অনুষ্ঠান ও মতবাদকে ভ্রান্ত বা মিথ্যা বলিয়া, মানব-সমাজে সেগুলির উদ্ভবকে শয়তানের কারসাজী বলিয়া মনে করে, এবং নানা উপায়ে নিজ ধর্ম কর্তৃক অননুমোদিত এই-সকল সাধন-পথকে বিনষ্ট বা দূরীভূত করিবার চেষ্টায় থাকে। "আমার সাধন-মার্গই একমাত্র সাধন-মার্গ", অথবা "আমার ধর্ম-সংস্থাপক গুরু বা মহাত্মার নির্দিষ্ট সাধন-মার্গই একমাত্র পারমার্থিক পথ"—এইরূপ ধারণার অবকাশই হিন্দুর মনে হইতে পারে না, কারণ হিন্দু-ধর্মের মধ্যে, অর্থাৎ হিন্দু-জাতির মধ্যে উদ্ভূত মতবাদগুলির মধ্যে, সাধারণ এবং ব্যাপক ভাবে, কোনও একটী বিশেষ মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। মানব-জাতি যুগ যুগ ধরিয়া নব নব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে-করিতে চলিয়াছে। অদৃষ্ট সত্তার পূর্ণ প্রকাশ যে কোনও বিশেষ দেশে বিশেষ একজন মহা-পুরুষের কাছে ঘটিবে, সেই প্রকাশ যে ভাবে ইঁহার কাছে হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্যবিধ ঐশ্বরিক প্রকাশের আর সম্ভাবনা নাই—একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এইরূপ মনোভাবের অন্তর্নিহিত ভাবটী যে ঈশ্বরীয় শক্তিকে কতখানি খর্ব করে, তাহা বুঝা যাইবে। এই কারণে, অন্ধ ভাবে মত-বিশেষের প্রতি নিষ্ঠা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক জীবনে যে ধরণের গোঁড়ামি ও পরমতাসহিষ্ণুতা আসিয়া যায়, হিন্দু ধর্ম তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দু কেবল একথা বলিয়া নিজের উদারতায় নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে না, যে, সকল ধর্মেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; হিন্দু বলে যে, বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি ও উপলব্ধির পথ—ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ যেমন অনন্ত, তেমনি মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকারও অনন্ত; সকল প্রকার অনুভূতিরই একটা সার্থকতা আছে;—সুতরাং অনুভূতি-লাভের বিভিন্ন প্রকারের পথ, বিভিন্ন প্রকারের সাধন-মার্গ, অথবা বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, সবই সত্য পথ,

সত্য সাধন-মার্গ। ইহার মধ্যে কেবল একটা কথা আছে—ব্যবহারিক দিক্ হইতে সেটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; যতক্ষণ না অপরের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাধন-মার্গকেই, প্রত্যেক ধর্মকেই, পুরুষার্থ-লাভের উপায় বলিয়া মানিতে হইবে,—নানা যুক্তি-সঙ্গত, এবং নানা সভ্য মানবের উপযোগী। এই জন্যই আধুনিক কালে হিন্দু সাধন-মার্গের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তাঁহার পরিচিত সমস্ত ধর্মের সাধনকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার পরিচিত সকল ধর্মের বিশিষ্ট অনুভূতি ও উপলব্ধির আস্বাদন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ণ বিশ্বাসের ও উপলব্ধির সহিত বলিয়াছিলেন, "যত মত, তত পথ।"

স্বামী বিবেকানন্দ যেন কোনও জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম হইতেছে যেন বিভিন্ন ভাষা। এই উপমাটী অতি সুন্দর ও সার্থক। সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য্য যাহা, তাহা গ্রীক বা চীনা বা আরবী ভাষার নহে, আবার আরবী বা চীনা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। একটী জিনিসকে, একটী বিশেষ গুরুর প্রচারিত মতকে সমগ্র হিন্দু সমাজ অন্ধ-ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে নাই—বহু গুরুর বা ধর্মদেষ্টার বহুবিধ মতের মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান হিন্দু ধর্মে আছে, সেই হেতু হিন্দুর পক্ষে একটা ভদ্র ও সভ্য-জনোচিত মনোভাবের অধিকারী হওয়া সহজ হইয়াছে। ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর (এবং হিন্দু বলিতে ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধ জৈন শিখ প্রভৃতি ধর্ম বা সম্প্রাদায়কেও বুঝায়) পরমত-সহিষ্ণুতা একটী অতি অদ্ভুত বস্তু, এবং এই পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব ঘটিলে মানুষকে সভ্য অথবা সংস্কৃতি-যুক্ত বলা চলে না। অন্যমতাসহিষ্ণু মুসলমান ও খ্রীষ্টান মনোভাবের প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবের ফলে, আধুনিক যুগে হিন্দু সমাজেও দুই একটী অসহিষ্ণু ও অনুদার মতবাদ বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, এই নবীন সম্প্রদায়গুলি হিন্দুর দেব-বাদ প্রতিমা-পূজা প্রভৃতি দুই-একটী ধার্মিক আচার বা অনুষ্ঠান

সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ কবিত, বা কবিযা থাকে; কাল-ধর্মের প্রভাবে এই সকল নবীন মতের অনুদাব ভাব এখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ধর্ম-বিষয়ে হিন্দু ববাববই সমন্বয় কবিবাব চেষ্টায় ছিল ও আছে, এবং এই ব্যাপারটী হিন্দুব পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই হেতু যে, হিন্দু একটী বিশেষ মতেব উপবে জোব দেয় নাই। যীশুব পিতৃরূপে কল্পিত ঈশ্ববেব প্রতি প্রেম, ও ভ্রাতৃরূপে কল্পিত মানুষেব প্রতি দযা, মোহম্মদেব ঈশ্ববেব সত্তায় একাগ্র বিশ্বাস ও ঈশ্ববেব উপব একান্ত নির্ভবশীলতা, জবথুশ্ত্রেব ঈশ্বব অর্থাৎ সত্যেব পক্ষ গ্রহণ-পূর্বক পাপ-পুরুষেব বা মিথ্যাব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব জন্য দণ্ডায়মান হওযা, বুদ্ধদেবেব সংসাবে ও কর্মে নিবৃত্তিব উপদেশ এবং সর্ব জীবেব প্রতি মৈত্রী ও করুণা, মহাবীব স্বামীর জীব-দয়া এবং জগতেব প্রতি বিতৃষ্ণা;—এ সবই হিন্দুব নিকট গ্রাহ্য। বিশেষ ব্যক্তিব মতের প্রতি একান্ত ও সর্বগ্রাহী নিষ্ঠাব অভাব, ও সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মহাপুরুষেব কৃতিকে ঈশ্ববেব অংশ বা বিভূতি বলিয়া স্বীকাব করা—ইহাই হিন্দুব প্রথম বৈশিষ্ট্য। ইহা ঋতন্তর, বিশেষ ব্যক্তি বা মানব অথবা মহাপুরুষেব বিচাব বা ধাবণা হইতে নিবপেক্ষ শাশ্বত সত্তাব যে পবিচালনী শক্তি, বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ধরিয়া বহিয়াছে যে ঋত, সেই ঋতকে ইহা বহন কবিতেছে।

[২] মুসলমান ধর্মেব creed বা ধর্ম-বীজ আছে, ইস্লামেব কল্মা-মন্ত্র—"লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্; মুহম্মদ বসুলুল্লাহ্"—"আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ ঈশ্ববেব প্রেবিত",—এই creed বা কল্মা না মানিয়া মুসলমান হওয়া যায় না; সকল মুসলমানকেই ইহা মানিতে হইবে, ইহাতে সায দিতে হইবে। সেইরূপ খ্রীষ্টানদেবও creed আছে—সেটী মানা চাই, নহিলে খ্রীষ্টান হওয়া ঘটে না; খ্রীষ্টান ধর্ম-বীজ, মুসলমান ধর্ম-বীজের মত অতটা সবল নহে, তাহা সকলেব পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কষ্ট-সাপেক্ষ; কিন্তু তাহাতে subscribe করা চাই, তাহা স্বীকাব করা চাই।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে নানা দার্শনিক মত আছে ; নিজের জ্ঞান ও রুচি মত যে-কোন মত গ্রহণ করিতে পারা যায় ; এগুলি ঈশ্বরে পহুঁছিবার ঋজু বা কুটিল নানা পথ মাত্র। হিন্দু ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেই এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই আসে। হিন্দু ধর্মের creed নাই, সেই জন্য কেহ-কেহ ইহাকে ধর্ম বলিয়াই মানিতে চাহে না। বাস্তবিক, সমগ্র মানব-জীবনের একটা creed, একটা সংজ্ঞা যেমন এক কথায় দেওয়া যায় না, হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। Creed না মানিলে দল পাকাইতে পারা যায় না ; এখানেই creed না থাকায় হিন্দুর সংঘ-বদ্ধতার অভাব ঘটে, এখানেই সামাজিক জীবনে হিন্দুর দৌর্বল্য। কিন্তু creed-এর বালাই নাই বলিয়া, পরমার্থ-সাধনের পথে হিন্দু মুক্ত।

[৩] প্রায় সব ধর্মের মতন হিন্দু এক শাশ্বত সত্তাকে মানে। সংক্ষেপে এই শাশ্বত সত্তার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। উহার প্রকাশ নানা ভাবে হয়। এই প্রকাশকে ধরিবার জন্য হিন্দু দুইটী মুখ্য পথকে স্বীকার করে—এক, জ্ঞানের পথ ; আর দুই, ভক্তির পথ, যুক্তি ও তর্ক বা বিচারের পথ, এবং অনুভব বা অনুভূতির পথ। হিন্দুদের মধ্যে কোনও-কোনও মতে একটীর দিকে বেশী করিয়া ঝোঁক দেওয়া হয়, যেমন শৈব চাহেন জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে, শাশ্বত সত্তাকে বুঝিতে ; বৈষ্ণব চাহেন, ভক্তির দ্বারা ইহাকে আস্বাদন করিতে। সাধারণ হিন্দু আদর্শে দুইটীকেই রাখা হয়—জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি, বা ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান। এই দুই পথ পৃথক্, কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক। এই দুই পথেরই সার্থকতা হিন্দু মানিয়া থাকে। সে হিসাবে, খ্রীষ্টান ধর্মকে কেবল ভক্তি-মূলক বা বিশ্বাস-মূলক ধর্ম বলা চলে।

[৪] বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ঐশ্বরিক সত্তা বা শক্তি বিদ্যমান ; "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে,"—ঐশী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বা বিশ্ব-প্রকৃতিতে লীলা করিতেছেন, মানব-দেহে মানব প্রকৃতিতেও লীলা করিতেছেন, শক্তি-রূপে, কাম-রূপে, দুঃখ-রূপে, সুখ-রূপে মানুষের জীবনে এই শক্তি

অদৃশ্য-ভাবে বিরাজমান, আবার জড় জগতের গতি ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই শক্তি ক্রিয়মাণ। যেমন যজুর্বেদের শতরুদ্রীতে বলা হইয়াছে,—"হে রুদ্র-শিব, তুমি পাতায় আছো, তোমাকে নমস্কার, তুমি পাতার ঝরাতেও আছো, তোমাকে নমস্কার।" নিজের জীবনে এই শক্তিকে অনুভব করা, এবং এই শক্তির নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবনকে চালানো, নিজের আভ্যন্তর নৈতিক জীবন এবং বাহ্য চরিত্রকে এই শক্তির সহজ ও সুষ্ঠু প্রকাশ-ক্ষেত্র করিয়া লওয়া—এইখানেই জীবনে ভগবানের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। হিন্দু ধর্মের ন্যায় সমস্ত স্বভাব-জাত ধর্মে, সমস্ত pagan ধর্মে, এই বিশ্বাত্মানুভূতি বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান, এবং এই বিশ্বাত্মানুভূতি আছে বলিয়া, এই-সমস্ত ধর্ম, পরমেশ্বর বা শাশ্বত সত্তাকে নিজের ধর্মের বা সম্প্রদায়ের খাস সম্পত্তি বলিয়া ধরিবার ধৃষ্টতা কখনও মনে আনিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম, জাপানের শিন্তো ধর্ম, চীনের তাও ধর্ম,—এ-সমস্তই, এই দিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যায় যে এগুলি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের। সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি এই বিশ্বাত্মানুভূতির একটী প্রথম ও প্রধান সুফল, এই ধারণার অনুসারে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে মানুষ তাহার স্থান বুঝে, এবং দম্ভ-ভরে নিজেকে বিশ্বের সম্রাট্ বলিয়া মনে করে না, ঘোষণা করে না। সমস্ত বস্তু ও ধর্মের—বস্তুর স্বকীয় গুণ ও ক্রিয়ার—পিছনে সর্বন্ধর শক্তির বা আত্মার প্রণিধান, এইরূপ মনোভাব ইহাতে সহজ হয়।

[৫] দুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাময়। মানুষের জীবনের জটিলতার এবং তাহার চির-বিদ্যমান অসামঞ্জস্যের সমাধানের পথও হিন্দু ধর্ম-চিন্তায় প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। জীবনে দুঃখ আছে—এই দুঃখকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দুঃখ দূর করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল বা কল্যাণ লাভের উপায় কি? সেই প্রকার কল্যাণ লাভ করা

যায় কি না? নানা ভাবে মনীষিগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমষ্টি-গত ভাবে সেই সমস্ত উত্তরেরই আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা আছে। ঈশ্বরকে মানিয়া অথবা না মানিয়াও এই উত্তর-দানের চেষ্টা হিন্দু জাতির মধ্যে হইয়াছে। প্রত্যেক উত্তরের যে একটা স্থান আছে, তাহা হিন্দু ধর্ম মানিয়া লয়। এই জন্য, ব্রহ্ম, মোক্ষ, নির্বাণ, সারূপ্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য, সালোক্য প্রভৃতি অবস্থায় পহুঁছিয়া দুঃখ-মূল সংসার বা কর্ম হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, নিজ নিজ জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতের মনীষীরা জন-সমাজে এই সমস্ত মুক্তি-মার্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি, দুঃখ-শান্তির পথের সাধন; এই সাধনগুলির পিছনে আছে, অহিংসা, আত্মদমন, মৈত্রী, করুণা, তিতিক্ষা, প্রভৃতি নৈতিক বা চারিত্রিক গুণ। দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা নানা প্রকারের হইবেই, কারণ বিভিন্ন মানুষের মনে দুঃখের সম্বন্ধে ধারণা নানা প্রকারের, এবং মুক্তির স্বরূপও নানা প্রকারের। কিন্তু মানুষের জীবনের সব দিক্ হইতে দুঃখকে তো দূর করিবার প্রয়াস করিতেই হইবে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, সব প্রকারের দুঃখ। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়া, যুক্তি ও তর্কের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন, এবং স্ব স্ব মানসিক প্রবণতা অনুসারে ও শিক্ষা এবং রুচি অনুসারে, বিভিন্ন পথ বা সাধন, বিভিন্ন আদর্শ আমাদের সামনে ধরিয়া গিয়াছেন। পথ এক নহে, বহু, আমরাও নিজ নিজ রুচি, শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে এই সমস্ত পথের একটা ধরিয়া লইতে পারি, অথবা যদি নূতন পথ, যাহা শাশ্বত সত্তার সঙ্গে যোগ হারায় না, আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাতেও আপত্তি নাই; কারণ হিন্দুধর্মের মত স্বভাব-জাত ধর্মে বিবর্তন অপেক্ষিত—কোথাও শেষ কথা বলিয়া full stop দিবার বা দাঁড়ি টানিবার হুকুম নাই।

[৬] হিন্দুধর্ম বিশ্বন্ধর, ইংরেজীতে যাহাকে বলে all-inclusive, সেই গুণ হিন্দু ধর্মে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। বিশ্বাত্মানুভূতি হইতেই ধর্মের বিশ্বন্ধরত্ব। 'ধর্ম' অর্থে হিন্দু কেবল অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া মনে করে না। 'ধর্ম' অর্থে—যাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, সমস্ত বস্তুর গুণ ও কর্ম, ধর্ম-শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের সমস্ত কার্য্য ধর্ম দ্বারাই পরিচালিত, 'ধর্ম' দ্বারাই দেশিত, কেবল বাহ্য লৌকিক আচারকে লইয়া হিন্দু ধর্ম নহে, আচার এবং লৌকিক বিধি-নিষেধ, দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থাগতিকে সমাজ-রক্ষার, সামাজিকগণের সুখ-সুবিধার জন্য গঠিত, ব্যবহারিক-ভাবে এগুলিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, কিন্তু "এহ বাহ্য",—এই সকল লৌকিক ধর্মের পিছনে বা এগুলির প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ যে "নিত্য-ধর্ম", যে-সকল নৈতিক ধর্ম বিদ্যমান, সেইগুলির উপরই প্রথম ও প্রধান ঝোঁক দেওয়া হয়। বাহ্য নাম ও রূপ, —এগুলি হইতেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাশ্বত সত্তার বিবিধ বাহ্য বিকার, এগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরোধ নাই—সকল জাতির মধ্যে উদ্ভূত সর্ব-প্রকারের ধর্ম-চেষ্টাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে, কারণ হিন্দু জানে যে, "যাহা আছে তাহা এক; পণ্ডিতেরা বহু ভাবে তাহার বর্ণনা করেন", অতএব কোনও কিছুকে, কি জীবনে, কি ধর্ম বিশ্বাস-সম্বন্ধীয় মতবাদে, হিন্দুধর্ম বাদ দেয় না—সেই হেতু হিন্দুধর্ম বিশ্বন্ধর।

ইহার উপরে আরও কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করা যায়, সেগুলিরও ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে করা হয়। যেমন "অহিংসা"; ব্রাহ্মণ এই অহিংসার এক রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জৈন আর এক রকম, বৌদ্ধ আর এক রকম; কিন্তু বিশ্বাত্মানুভূতি হইতে অহিংসা-বৃত্তির উদ্ভব, ইহার মূল প্রেরণা এই ধরণের মনোভাব—"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা, ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥" অর্থাৎ 'নিজের

প্রাণ যেমন নিজের কাছে প্রিয়, অন্য প্রাণীদেরও তাহাই; এইজন্য সাধুগণ নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া করেন।' অহিংসার অন্তর্নিহিত মনোভাবে এখনও পৃথিবীর বহু বহু জাতি পঁহুছায় নাই। খামখা রক্তপাতে জুগুপ্সা, সকলের সঙ্গে ভদ্র-ভাবে মিলিয়া চলা,—এইরূপ সভ্য আদর্শ যতক্ষণ না জগতের লোকে গ্রহণ করিতেছে, ততদিন অহিংসার আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজে স্বীকৃত বা আদৃত হইবে না। "অহিংসা" ছাড়া, —শাশ্বত বস্তুর আকর্ষণে ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসকে হিন্দু ধর্মে দার্শনিক আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস খ্রীষ্টান ধর্মেরও আদর্শ, অন্য ধর্মেও আছে, কিন্তু হিন্দু ধর্মানুমোদিত ত্যাগের আদর্শ একটু বৈশিষ্ট্যময়, একটু অন্তর্মুখী।

স্বভাব-জাত, শাশ্বত, ঋতম্ভর ও বিশ্বম্ভর ধর্ম এই হিন্দু ধর্মে আবার বিশেষ করিয়া দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ ভারতের সভ্যতার রঙও যথেষ্ট লাগিয়াছে। যেমন আর্য্য ও অনার্য্যের চিন্তাধারার ও অনুষ্ঠানের মিলন ও মিশ্রণের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই ইহার উদ্ভব ও বিকাশ, অনার্য্যের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত আর্য্যের ভাষা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ইহার প্রধান বাহন, আর্য্য-অনার্য্যের ধর্মানুষ্ঠান হোম যোগ ও পূজা প্রভৃতিতে ইহার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। কিন্তু সকলেই জানেন, এগুলি বহিরঙ্গ, ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপে বা প্রকাশে, বিশেষ ভাষা, বিশেষ ধরণের সাধন-পথের অপেক্ষা নাই। অবাঙ্‌মনোগোচর, ভাষাতীত, মানব-জীবনের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্ত পার্থিব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান যে সত্তা, তাহা যে কোনও লৌকিক অবস্থার সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত নহে,—হিন্দু যতটা জোরের সঙ্গে একথা বলিয়াছে, যতটা গভীর ভাবে ইহার অনুভব করিয়াছে, এমন আরও কোনও ধর্মের লোকে নহে। সেই জন্য, সুদূর বৃহৎ-ভারতের এক অংশ, যবদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত বলিদ্বীপে জনৈক স্থানীয় রাজা, হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া নিজের পরিচয় সগর্বে

যিনি দিয়া থাকেন, তিনি, পূজা, দেবার্চনা, দেবতা-বাদ, শ্রাদ্ধ, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়া এবং কথা কহিয়া, শেষে প্রশ্ন কবেন, "মানুষেব জীবনে লক্ষ্য কি?" এবং নিজেই যে উত্তব দেন, তাহা ব্যাখ্যা কবিযা বলিলে এই রূপ দাঁড়ায়—"নামরূপ দ্বাবা সীমিত লৌকিক ধর্ম, ও তাহাব অনুষ্ঠান পালন কবা, ইহা জীবনেব লক্ষ্য নহে, সত্য 'ধর্ম' নহে; লক্ষ্য হইতেছে—নির্বাণেব সাধন, পবম সত্তাব সাক্ষাৎকাব।" ইহাই হিন্দুধর্মেব সাব এবং শেষ কথা: লৌকিক ধর্ম, আচাব-অনুষ্ঠানেব আবশ্যকতা, নিচেব দিকে লক্ষ্য বাখিযা, সাব সত্য, মানুষেব পবমার্থ হইতেছে ইহাই—বিশেষ কোনও ধর্মমতেব অতীত শাশ্বত সত্যেব লাভ॥

[আশ্বিন, ১৩৫০]

হিন্দু আদর্শ ও বিশ্ব-মানব

কোনও আদর্শ বা মনোভাব একটী বিশেষ কোনও জাতিব বা জন-সংঘেব একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। প্রচাব ও শিক্ষাব ফলে ইহাকে সর্বজন-গ্রাহ্য কবিয়া তুলা যায়, ইহা তখন বিশ্ব-মানবেব সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে জাতির বা যে জন-সমাজের মধ্যে আদর্শটী বা মনোভাবটী সাধারণ্যে পালিত, অনুসৃত বা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেই জাতি বা জন-সমাজেব নামেব সঙ্গে ইহাকে জড়িত কবিয়া রাখিতে আপত্তি না হইতে পারে, এবং আপত্তি হওয়া উচিতও নহে। ভাবতেব হিন্দু জনসংঘেব মধ্যে বিদ্যমান কতকগুলি আদর্শ ও মনোভাব বিশ্বজনেব গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়, কিন্তু সেই আদর্শ বা মনোভাবগুলি এখনও পৃথিবীব তাবৎ জনগণেব মধ্যে ব্যাপক-ভাবে গৃহীত হয় নাই। উপস্থিত সেই আদর্শ বা ভাবগুলিকে আমবা 'হিন্দু আদর্শ' এবং 'হিন্দু ভাব'-ই বলিব; এক কথায়, 'হিন্দুত্ব' বলিব। হিন্দুত্বেব লক্ষণ কি, এবং বিশ্ব-মানবেব পক্ষে ইহাব উপযোগিতা বা উপকাবিতা কতদূব, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কবিযা দেখা যাক্।

হিন্দুত্বেব সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্দেশ কবিবাব প্রয়াস অনেকে করিযাছেন। এ বিষযে যথোচিত অধ্যয়ন, অভিনিবেশ ও উপলব্ধি, এ তিনেবই অভাব আমাব আছে; তথাপি আমিও এই অনধিকার-প্রবেশ কবিতে সাহসী হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাব অভিমত প্রকাশ কবিয়াছি, আমার এই ধৃষ্টতাব একমাত্র কাবণ, হিন্দুত্বকে আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহাতে তাহাব প্রতি আমাব আন্তবিক আকর্ষণ ও অনুবাগ। আমাব মনে হয়—হিন্দুত্বেব লক্ষণ বা সংজ্ঞা বা প্রতিষ্ঠা এই ভাবগুলিকে লইয়া; (১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে একটী শাশ্বত সত্য বিদ্যমান আছে, এই আস্থা বা বিশ্বাস বা উপলব্ধি,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই সত্তার অপরিহার্য্য গুণ বা লক্ষণ, মানুষ নিজ জীবনে জ্ঞান অথবা অনুভূতি দ্বারা এই সত্তার পরিচয় লাভ করিতে পারে। (২) পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া মানব-জীবনে, যে দুঃখ আছে, তাহার নিরসনের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা। (৩) মানব এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ শাশ্বত সত্তার সহিত সংযুক্ত, মানব বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা পদার্থ নহে, সে বিশ্বেরই অংশ, যে বিশ্বের মধ্যে পরমাত্মা বা শক্তি বা ঋত অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে, উহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। (৪) শাশ্বত সত্তার উপলব্ধি মানবের পক্ষে একমাত্র পুরুষার্থ, এবং এই পুরুষার্থের সাধনের উপায় বা পথ এক নহে, বহু; শাশ্বত সত্তা বহুপ্রকাশময়। একটী বিশেষ প্রকারের উপলব্ধি বা অনুভূতি, শাশ্বত সত্তায় বা পরম সত্যে পহুঁছিবার একমাত্র উপায় নহে। হিন্দুত্ব একটী বিশিষ্ট ধর্মমতকে আশ্রয় করিয়া নহে, 'যত মত তত পথ', ইহাই হইতেছে ইহার এক লক্ষণীয় আদর্শ। মানব নিজের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা পায়, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, সব মানুষকে একটী বিশিষ্ট ধর্মমতের অধীনে আসিতেই হইবে, ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে একটী নির্দিষ্ট ধারণা তাহাকে পোষণ করিতেই হইবে, অন্যথা তাহার মুক্তি নাই—হিন্দুত্ব এরূপ বিচার স্বীকার করে না, বরং এইরূপ বিচারকে অশ্রদ্ধেয় এবং অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করে।

হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও দুই-একটী কথা আমাদের জানিয়া রাখা চাই। ধর্ম-মাত্রেই মানুষের নৈতিক জীবন বা নৈতিক চরিত্রের একটা উচ্চ আদর্শ আছে। হিন্দুধর্মেও তাহাই। এই-সব চরিত্র-নীতি, যাহা ধর্মের নিত্য প্রতিষ্ঠা, যাহা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে, যেমন সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য

প্রভৃতি, এগুলিকে হিন্দুধর্মে 'নিত্য ধর্ম' বলে। ইহার পরে আসে 'লৌকিক ধর্ম', যাহা দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ। এ ছাড়া, হিন্দুর সম্বন্ধে আরও দুইটী বড় কথা আছে। এক—এটী হইতেছে সহজ বা প্রকৃতিজ ধর্ম, ইংরেজীতে যাহাকে natural religion বলে। এই ধর্ম, মাত্র একজন বিশিষ্ট অবতার বা ঋষি বা চিন্তানেতার উপদিষ্ট নহে, ইহা স্বাভাবিক-ভাবে একটী সমগ্র জন-সমাজের চিন্তানেতাদের বহুযুগ-ব্যাপী সাধনা ও চিন্তার ফলে ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহা সমগ্র জীবনের মত সর্বঙ্কষ। আর, দুই—ইহার সহিত জড়বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় সাহায্যে অবলোকন ও অনুশীলন করিয়া বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে এত বিস্ময়কর তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সহিত হিন্দুধর্মের সাধারণ attitude অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর বা ব্যবহারের একটা সহজ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তা 'খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে,' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লীলায়িত, আবার মানুষের দেহপিণ্ডে অর্থাৎ দেহ ও দেহাশ্রয়ী ধর্মসমূহেও লীলায়িত, এই এক শক্তির বিশ্বগ্রাহিতা-সম্বন্ধে দরদ বা বোধ, হিন্দুত্বকে সত্যই in tune with Infinity—বৈজ্ঞানিক অর্থে যে Infinity ধরা যায়, যে অনন্তকে ও বিশ্বরূপকে ধরা যায়, তাহার সহিত এক সুরে বাঁধিয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী Romain Rolland রোমঁ্যা রোলঁ্যা যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়া দিবার মতন (শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারস্বামীর বিখ্যাত পুস্তক The Dance of Siva-র ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় রোলঁ্যা যাহা লিখিয়াছেন তাহার ইংরেজী অনুবাদ) :—But after having allowed myself to be swept away by the powerful rhythm of Brahmin thought, along the curve of life, with its movement of alternating ascent and return, I come back to my own century, and while

finding therein the immense projections of a new cosmogony, offspring of the genius of Einstein, or deriving freely from his discoveries, I yet do not feel that I enter a strange land. For, in the journey of the spirit across stellar space, even to the deeps of the planetary void, amid the Islands of the Cosmos, the nebular spirals, the countless Milky Ways, and through the millions of creations which sweep along down Space-and-Time, that endless, limitless arc, the rays of whose suns, revolving eternally, could light up phantom, insubstantial worlds, I yet can hear resounding still the cosmic symphony of all these planets which forever succeed each other, are extinguished and once more illumined, with their living souls, their humanities, their gods—according to the law of the eternal To Become, the Brahmin Samsara—I hear Siva dancing, dancing in the heart of the world, in my own heart.

এই সুন্দর উক্তির বাঙ্গালা অনুবাদ দিবার চেষ্টা করিব না। সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ্য চিন্তার পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে, এই আইনষ্টাইন্ প্রমুখ মনীষীদের আবিষ্কৃত দেশ-কালাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে পুনরাগমন করিলে, আমার মনে হয় না যে আমি কোনও সম্পূর্ণ বিপরীত ও নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। আধুনিক বিজ্ঞান যেভাবে এখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে দেখিতেছে, তাহা ব্রাহ্মণ্য চিন্তায় 'সংসার' অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েরই অনুরূপ একটা কিছু,

এই বিশ্ব-সংসারের গতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দ্বারা কল্পিত বা উপলব্ধ সেই নটরাজ শিবেরই নৃত্যচ্ছন্দ আমি শুনিতে পাইতেছি—কেবল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নহে, আমার অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যেও।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু চিন্তা (হিন্দু অর্থে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, সবই) মানব-জাতির উন্নয়নের জন্য সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে ও আংশিকভাবে পূর্ব-ইউরোপে যাহা করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের কথা, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। হিন্দু দর্শনের গভীরতম তথ্যগুলি হইতেছে মানুষের আভ্যন্তর জীবনের আশা-আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া। সেগুলির সামাজিক মূল্য বা কার্য্যকারিতা হইতেছে পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে। কোনও জড়-বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ নাই এবং কোনও মানবের সহিত ইহার বিরোধ নাই,—এই দুইটীই হইতেছে হিন্দু আদর্শের বা হিন্দুত্বের সব চেয়ে বড় মানসিক এবং সামাজিক বা ব্যবহারিক দিক্, এবং এইখানেই বিশ্ব-মানবের কাছে হিন্দুত্বের একটা মস্ত যুগোপযোগী বাণী আছে। সাধারণতঃ মূসাঈ বা ইহুদী ধর্ম, ঈসাঈ বা খ্রীষ্টান ধর্ম ও মোহম্মদীয় বা ইসলামী ধর্ম, এই তিনটীতে যে মনোভাব দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক তাবৎ natural religion অর্থাৎ সহজ বা প্রকৃতিজ ধর্মে দেখা যায় না—যেমন প্রাচীন অসুর-বাবিলনের ধর্মে, মিসরীয় ধর্মে, গ্রীক ধর্মে, চীনা ধর্মে, আমেরিকা ও আফ্রিকার ধর্মে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপময় জগতের ধর্মে। আমার ধর্মের প্রতি ঈশ্বরের অথবা শাশ্বত শক্তির একটা পক্ষপাতিত্ব আছে, অথবা আমার কল্পিত বা অনুভূত ঈশ্বরই হইতেছেন সত্য, অপরের কল্পিত বা অনুভূত বা উপলব্ধ ঈশ্বর ঝুটা,—এরূপ মনোভাবকে সভ্য বা সংস্কৃতি-পূত মানবের মনোভাব কোনও কালে কেহ বলিবে না। হিন্দু জাতির মধ্যে এরূপ অসহিষ্ণু মনোভাব যে কখনও দেখা দেয় নাই, একথা বলা চলে না; কিন্তু হিন্দু সমাজ বা হিন্দু জাতি, ব্যাপক ভাবে সে মনোভাবে

সায় দেয় নাই,—যাহাদেব মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব আসিয়াছে, তাহাবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-নিবদ্ধ হইয়াই রহিয়াছে। অপব পক্ষে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদেব মধ্যেও যে উদাবতাব ও পবমত-সহিষ্ণুতাব অভাব ছিল, তাহা বলিলে সত্যেব অপলাপ করা হইবে। বহু খ্রীষ্টান ও মুসলমান সাধক নিজ চিন্তায় ও আচবণে ঈশ্ববানুভূতিব অনন্ত স্বরূপেব কথা স্বীকাব কবিযাছেন, ইহুদী জাতিব মধ্য হইতে আধুনিক কালে চিন্তাব স্বাধীনতাব আবাহনকাবী বড-বড মনীষী উদ্ভূত হইয়াছেন। ইস্‌লামেব মধ্যে বিশেষ কবিয়া সূফী অনুভূতি ও দর্শন যে বিশ্বমানব-গ্রাহ্য সর্বদ্বব উদাব মনোভাবে পহুঁছিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কব, পুলকাবহ, হিন্দুত্বেব সঙ্গে তসওউফ বা সূফী অনুভূতি এখানে হাত ধবাধবি কবিয়া চলিতে পাবে, উভয়ে মিলিত ভাবে বিশ্বমানবেব মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা কবিতে পাবে। কিন্তু natural religion-এব প্রতিষ্ঠাব উপবে দণ্ডায়মান বলিয়া হিন্দু অনুভূতি ও পবমত-সহিষ্ণুতা যেখানে একটী সহজ ও স্বাভাবিক বস্তু হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং ব্যাপক ভাবে হিন্দু জাতি কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, সূফী মনোভাবকে সেখানে সঙ্কীর্ণতাব সঙ্গে, পবমতাসহিষ্ণুতার সঙ্গে, 'সত্য আমাবাই আয়ত্তাধীন, আব কাহাবও নহে,' এইরূপ মনোভাবেব সঙ্গে, এবং 'আমাব কল্পিত সত্য যাহাবা না মানে, তাহাবা সত্যেব শত্রু, ঈশ্বরেব শত্রু, অতএব তাহাদেব বিনাশ ঈশ্বরেব অভিপ্রেত' এইরূপ ব্যবহারেব সঙ্গে, বহু বিবোধ কবিয়া তবে নিজ স্থান কবিয়া লইতে হইয়াছে; সমাজেব একটা বড অংশে স্থান কবিয়া লইতে পাবিলেও, সূফী-মতেব বিবোধী সঙ্কীর্ণতা এখনও দূবীভূত হয় নাই। যাঁহাবা এবিষয়ে একটু আলোচনা কবিয়াছেন তাঁহারাই এই উক্তিব যাথার্থ্য স্বীকাব কবিবেন।

আমরা বিরোধের দিকে জোর দিব না, বিবোধকে আমরা অস্বীকাব করিব। যেখানেই আমবা হিন্দু আদর্শেব সঙ্গে আপনাকে খাপ খাওয়াইতে

পাবে, এমন উদার মনোভাব দেখিব, সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইব। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষ একই সার সত্যের পথে যাত্রী; এই যাত্রাপথে পরমত-সহিষ্ণু হিন্দু আদর্শ যতটা সহায়ক হইতে পারিবে, পরমতকে না বুঝিয়া তাহাকে 'ন-স্যাৎ' করিয়া বর্জন বা বিনাশ করিবার মতন আদর্শ বা মনোভাব ততটা পারিবে না; কেবল তাহাই নহে, ইহা বিভেদ ও বিরোধিতা আনিবে। আজকাল Imperialism-এর দিন চলিয়া যাইতেছে, Totalitarianism-এ কেহ সায় দিবে না, ধর্ম-জগতেও সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বগ্রাসিতা বা সর্বধ্বংসিতার কাল আর নাই। Discord বা বিবাদ না আনিয়া, Harmony বা সংবাদের সাহায্যে, এক নূতন বিশ্ব-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার কথা সকল দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন। হিন্দু আদর্শ—অর্থাৎ, নিজ মূল প্রকৃতিতে বা অবস্থানে অথবা স্বরূপে, এক, অখণ্ড এবং অদ্বিতীয় শাশ্বত সত্য যে প্রকাশে বহুরূপ ও বহুমুখ, এবং এইহেতু নানাভাবে ইহার উপলব্ধি যে সম্ভব, এই বোধ—বিশ্বসংস্কৃতি গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য বিশ্বমানবের সেবায় 'হিন্দু' মনোভাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে॥

[কার্ত্তিক, ১৩৫০]

ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর-ভারত

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবি Rudyard Kipling র‍্যডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ কোথায় বলিয়াছেন—He knows not England who only England knows, অর্থাৎ যে খালি ইংলাণ্ডকেই জানে, সে সত্যকার ইংলাণ্ডকে জানে না। কথাটী খুব খাঁটী। পরিধি বা বৃত্ত হইতে না দেখিলে, নিজ প্রতিষ্ঠার বা কার্য্যকারিতায় কেন্দ্রকে ঠিক বুঝা যায় না; এবং কোনও ক্রিয়ার মূল্য বা উপযোগিতা নির্ধারণ করিতে হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখা আবশ্যক। কিপ্‌লিঙ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংলাণ্ডের কার্য্যাবলীর সার্থকতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়াই এ কথা লিখিয়াছিলেন—যদি ইংলাণ্ডের অধিবাসী ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে দেখ, বাহিরের নানা জাতির মধ্যে গিয়া ইংলাণ্ডের লোকেরা কত বড় সব কাজ করিয়াছে ও করিতেছে।

মানুষকে সভ্য এবং মানবোচিত পদে উন্নীত করিবার জন্য পৃথিবীতে যে-সমস্ত মনোভাব ও চেষ্টা কার্য্যকরী হইয়াছে, ভারতের সংস্কৃতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের বৃহত্তর অংশের মধ্যে উচ্চ কোটির আধ্যাত্মিক জীবন বলিতে, ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা আবিষ্কৃত, শৃঙ্খলিত এবং মানবের উপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত ভাবাবলীর আহ্বানে এশিয়া-খণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কি ভাবে সাড়া দিয়াছিল, মুখ্যতঃ তাহাকেই বুঝায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এশিয়া-খণ্ডের বহু পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে সর্ব-প্রধান সংস্কৃতি-বাহক শক্তির আগমন ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল। একজন ফরাসী লেখক,

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভ হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বছর ধরিয়া, ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিবাব পব হইতে ভাবতে তুর্কী-বিজয় পর্য্যন্ত, এশিয়া-মহাদেশে ভারতের সভ্যতাব প্রসাবেব কথা বিচাব কবিয়া ভারতকে L' Inde Civilisatrice অর্থাৎ India the Civiliser, 'সংস্কৃতিবাহী ভারতবর্ষ' এই আখ্যায় অভিহিত কবিয়াছেন, এই আখ্যা ভাবতেব পক্ষে খুবই সমীচীন। এই দুই হাজাব বছরেব মধ্যে আমবা এক দিকে যেমন ভাবত-বর্ষের মধ্যে সাবা দেশেব জনগণকে একই সংস্কৃতিব বাঁধনে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা হইতে দেখিতেছি, তেমনি অন্যদিকে সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্‌বিজয় সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে, আফগানীস্থানে ও মধ্য-এশিয়ায়, শ্যাম, কম্বোজ ও চম্পায়, মালয় উপদ্বীপে ও দ্বীপময় ভাবতে—সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতে—বিস্তৃত হইতেছে, ইহাও দেখিতেছি, এবং এই যুগেব মধ্যে, বিশেষ কবিয়া ইহাব দ্বিতীয়ার্ধে, ভাবতের আধ্যাত্মিক চিন্তাশক্তিব সহিত সংস্পর্শে আসিয়া সুসভ্য চীনেব সংস্কৃতিতে এক অপূর্ব পবিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য কবিতেছি। চীনেব শিষ্য কোবিয়া ও জাপান এবং তোঙ্‌-কিঙ্‌ ও আনামও ভাবত-ধর্মেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত এক অভিনব সংস্কৃতিতে এই যুগেব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিতেছি। ওদিকে মুসলমান জগতেও ভাবতেব জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাবতেব সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য কবিতেছে, এবং ভারতেব দর্শন—বেদান্ত—পবোক্ষভাবে সূফী অনুভূতি-মূলক দর্শনকে গড়িয়া তুলিতে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য কবিতেছে, তাহাও লক্ষ্য কবিবাব বিষয়।

কিন্তু ভাবতেব প্রাচীন সংস্কৃতি, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতি, কেবল একটী সামান্য বা সাধাবণ সভ্য জগৎ মাত্র ছিল না। এশিয়াব বহু পশ্চাৎপদ জাতির কাছে উচ্চ ধবণের সামাজিক বীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি

ও সঙ্গে-সঙ্গে সব প্রকারের শিল্প ও কলা এবং মানসিক শিক্ষা তখনই প্রথম উদিত হইল, যখন তাহাদের মধ্যে ভারতীয় বণিক্ আসিয়া পহুঁছিলেন, এবং বণিকের সঙ্গে-সঙ্গে আসিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত; এই ব্যাপার খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব হইতেই, সম্ভবতঃ বুদ্ধ-জন্মেরও পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; বৌদ্ধ ধর্মের পরে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুও আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের আগমনে এই সকল পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত জাতির লোকেরা—যেমন, ইন্দোচীনের ও দ্বীপময় ভারতের অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রোনেসীয় জাতি, ইন্দোচীনের এবং তিব্বতের ভোট-চীন গোষ্ঠীর দৈ বা থাই অর্থাৎ শ্যামী জাতি, ম্রন্-মা বা ম্যাম্মা অর্থাৎ বর্মী জাতি এবং বোদ্ অর্থাৎ ভোট বা তিব্বতী জাতি, মধ্য-এশিয়ার অনুন্নত ঈরানী জাতি (সুলিক বা সোগ্দীয় এবং কুস্তন বা খোতানী) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ঋষিক বা তুষার অথবা কুচী জাতি, তথা মধ্য ও উত্তর-এশিয়ার তুর্কী ও মোঙ্গোল জাতি—কেবল যে পার্থিব সভ্যতায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা নহে, ভারতের চিত্ত এবং চর্য্যার সোনার কাঠির স্পর্শে ইহাদের সুপ্ত মানসিক ও অন্তর্বিধ শক্তি প্রাণ পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই-সকল জাতির লোকেরা এই স্পর্শলাভের ফলে, কোনও প্রকার বাধা-গ্রস্ত না হইয়া তাহাদের শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাহাদের চিত্তের এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশের পথে, ভারতের সহিত সংস্পর্শের ফলে কোনও অসহিষ্ণু ও বিপরীত-ধর্মা মনোভাবের সহিত সংঘাত ঘটে নাই, ভারতীয় মনোভাব এমন ছিল না যে এইসব জাতির চিন্তা রীতির এবং অনুভূতির আধার-ভূমির বৈশিষ্ট্যকে অনুকম্পা-বিহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া অস্বীকার করিবে, অথবা উড়াইয়া দিতে চাহিবে। কারণ, ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা নিজেই একটী বিরাট্ সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা বা সর্বন্ধনত্বের ভিত্তির উপরে স্থাপিত; এই সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা মানব-সংক্রান্ত কোনও কিছুকে তাহার নিজ

সত্তায় ঈশ্বরের কাছে অথবা অন্য মানবের কাছে অগ্রাহ্য অথবা জুগুপ্সার যোগ্য বলিয়া মনে করে না। ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে যে-সকল জাতি ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের আত্মসম্মানের কোনও হানি না করিয়া, ভারতীয় হিন্দু চিত্তের এই মৌলিক উদারতা তাহাদের সভ্য মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল ; তাহারা এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীর এবং বিস্তৃত জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের নিজেদের আহৃত ও স্বকীয় বিশিষ্ট উপাদান-সম্ভারের দ্বারা, এই সংস্কৃতিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে আরও পরিবর্ধিত ও বিশ্বমানবের পক্ষে আরও উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্য্যার সমন্বয়—একটী বিশিষ্ট বা বিশেষ শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ সংঘ-নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্য্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে। এইজন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটী বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা বা সভ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। অবশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্য জাতির লোকেদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল, একথাও সত্য ; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটা বড় কাজ করিয়াছিল—অন্য জাতির স্বকীয় আদর্শ ও ভাবরাজিকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া এ কার্য্য করে নাই, বা বিনাশ করিবার চেষ্টা করে নাই। চীনের মত সুপ্রাচীন ও সুসভ্য জাতির পক্ষে (এশিয়া-মহাদেশে ভারত এবং চীন কেবল এই দুই দেশেই, অন্য জাতির মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল এমন সংস্কৃতি, স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল), ভারতীয় চিন্তা ও চর্য্যার সহিত সংস্পর্শ তাহার স্বকীয় সভ্যতার পরিপূরণ করিতে এবং সেই সভ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাইতে সহায়ক হইয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম চীনদেশে আসার ফলে, এই সুধী

এবং কৃতী জাতির নিকটে মানব-জীবনেব অস্তিত্বের এবং মানবের কর্ম-চেষ্টার মূল তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন কবিয়া প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিযাছিল, এবং এই প্রশ্ন সমাধানের আকাঙ্ক্ষা আনিযা দিয়াছিল। বহু পূর্বে চীনা ঋষি লাও-ৎসি এইরূপ গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন চীনাদের মধ্যে উত্থাপন কবেন; বৌদ্ধ ধর্মেব অন্তর্মুখিতা দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই খুশী হইতেন, কিন্তু তাঁহাব সময়ে চীনাবা আধ্যাত্মিক বিষযে গভীবতাব ধাব ধাবিত না, স্বয়ং খুঙ্-ফু-ৎসি, যিনি আধ্যাত্মিকতাব বা বহস্যবাদেব কথা বুঝিতেন না (এবং এইজন্য যিনি স্থূলদৃষ্টি, ভাব অপেক্ষা কর্মপ্রিয় চীনা জাতিব গুরু বা চিন্তানেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন), তিনি লাও-ৎসি প্রোক্ত নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্ব-নিয়ন্তৃ বিশ্বাত্ম-স্বরূপ 'তাও' বা ঋত এবং তাহাব বাহ্য প্রকাশ বিশ্বজগতেব ক্রিয়া, এইসব বিষয়ে লাও-ৎসিব গভীর তত্ত্বকথা ধবিতে পাবেন নাই। কিন্তু উত্তব কালে ভাবতেব বৌদ্ধধর্ম আসিয়া চীনের মনে গভীবতব চিন্তাব জ্যোতির্ময় স্পন্দন আনিয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদযে ভাবাবেগেব প্রবল বন্যা বহাইযা দিয়াছিল; এবং এইভাবেই ভাবতেব সহিত মিলনে চীন যেন নিজ গভীরতম প্রকৃতিকে খুঁজিযা পাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভাবতীয সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিযাছিল, সেখানে ধ্বংস কবিতে যায় নাই, গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে। বিভিন্ন দেশে ইহা প্রাণদান-কাবী বর্ষাবাবির মত আসিয়াছিল, ইহাব আগমন একেবারেই মরুভূমিব লু-বাযুব-মত, অথবা ধ্বংসকারী মাবীর মতন ছিল না। মেক্সিকো, মধ্য-আমেবিকা ও পেরু দেশেব প্রাচীন সংস্কৃতি যেভাবে বোমান-কাথলিক স্পেনের স্বর্ণ-গৃধ্নুতা, কুসংস্কাব এবং ধর্মান্ধ বর্বরতার হাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা কবিয়া আমাদের মনে একটা বিক্ষোভ না আসিয়া পাবে না। •সহৃদয় ও কল্পনা-শক্তি-যুক্ত যে-কোনও সজ্জনেব মনে, স্পেনীয়গণ কর্তৃক আমেবিকাব এই-সব প্রাচীন সুসভ্য জাতিব জয়, একটী

ধ্বংস-তাণ্ডবের মতই লাগিবে—এই ধ্বংস-কার্য্যেব মধ্যে একটুখানিও মঙ্গলের আভাস নাই,—এক মেক্সিকো ও মধ্য-আমেরিকার জনগণের মধ্যে নরবলি-প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া; কিন্তু এই নরবলি বন্ধ করিয়া যেটুকু মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে স্পেনীয়েরা Inquisition অর্থাৎ ধর্মেব নামে নিষ্ঠুর-ভাবে প্রাণবধের রীতি এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাসত্ব প্রতিষ্ঠিত কবে। তাহাদেব হাতে কয়েকটী সমগ্র জাতিব নরনাবীব কয়েক-শত-বর্ষব্যাপী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, মানসিক ও আত্মিক অবনতি ঘটিতে থাকে—এখনও সর্বত্র সে অবনতির শেষ হয় নাই। আমেরিকার Aztec আস্তেক, Maya মায়া, Inca ইঙ্কা প্রভৃতি জাতিব পক্ষ হইতে বিচার কবিয়া দেখিলে, স্পেনীয় বিজয় আসিয়াছিল যেন ইহাদেব উপবে ঈশ্বরেব অভিশাপ-রূপে; স্পেনেব তথাকথিত 'উচ্চকোটি'র খ্রীষ্টান ইউবোপীয় সভ্যতা এইসব কৃতী ও সভ্য জাতির মধ্যে যে-ভাবে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাব ফলে ইহাবা সব দিক্ দিযাই বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইতে থাকে;—তাহাদেব নিজেদেব অবিনশ্বর প্রাণধর্মেব ও প্রাণশক্তির সহাযতায় এবং নূতন যুগের কালধর্মের ফলে, মেক্সিকোতে তাহারা এখন এতদিন পরে এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার এইসব সুসভ্য আদিম জাতির লোকেদের পবমতাসহিষ্ণু স্পেনীয় রোমান-কাথলিক চিন্তা ও চর্য্যার অনুগামী কবিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টার ফলে, ইহাদের জীবনের ও ইহাদের সংস্কৃতিব যাহা নষ্ট হইয়াছে, অথবা নির্বোধ স্বার্থের ও ধর্মান্ধতার হাঁড়িকাঠে যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাব অভাবে বিশ্বমানব-সংস্কৃতির ভাণ্ডার চিবকাল ধরিয়াই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমেরিকার আস্তেক, মায়া ও ইঙ্কা সভ্যতাব সর্বোচ্চ কৃতিত্বের ও নানা গুণের কথা মনে করিয়া, আমরা তদ্বিষয়ে একটা আকুলতা অনুভব করিয়া থাকি, এবং এবং এই সভ্যতাগুলির পক্ষে, ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া নিজ-নিজ বিশিষ্ট,

আরও উচ্চ শিখরে আরোহণ করার সুযোগ বা অবাধ গতি স্পেনীয়দের আগমনের ফলে আর যে মিলিল না, এবং সেই হেতু মানব-জাতি যে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া রহিল, একথা স্মরণ করিয়া আমরা বিষাদগ্রস্ত না হইয়া পারি না।

স্পেনীয় বিজেতাদের সঙ্গে মেক্সিকো বা পেরুর সংযোগ যদি কখনও না ঘটিত, তাহা হইলে তাহার জন্য দুঃখের কি থাকিতে পারে? কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত সংস্পর্শের ফলে, জীবনের এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ অভিজ্ঞতার যে ঐশ্বর্য্য, সাহিত্য, শিল্পকলা ও ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং তাহাদের মনের ও আত্মার যে বিস্ময়কর ও পুলকাবহ বিকসন ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন যবদ্বীপ বা শ্যাম, চীন বা জাপানের কল্পনাও কি আমরা করিতে পারি? আজকাল আমেরিকার, বিশেষ করিয়া মেক্সিকোর, এ-পর্যন্ত ক্রীতদাসের অবস্থাতে অবনীত আদিম জনগণের মধ্যে এক পুনর্জাগৃতির কথা আমরা পাঠ করি, এই পুনর্জাগৃতির ফলে, মেক্সিকোর প্রাচীন আস্তেক দেবতা Quetzalcoatl কেৎসাল্‌কোআৎল্‌ বা Tlaloc ৎলালোক আবার সম্মানের সহিত পুনরুজ্জীবিত হইতেছেন এবং স্পেনীয়দের দ্বারা আমদানী করা রোমান-কাথলিক Saint-নামধারী ঠাকুরদের স্থানে ইহাদের অংশতঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। স্পেনীয়দের আগমনের পূর্বে ইহাদের মধ্যে যে ধরণের গভীর ধর্মভাব ও অনুষ্ঠান ছিল, যে প্রাচীন পূজানৃত্যে ও বিশেষ ধরণের নৈবেদ্য-অর্পণের রীতি ছিল, সে-সব রোমান-কাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া এখনও বিদ্যমান; সেই ধর্মভাব Guadalupe Hidalgo 'গুয়াদালুপে হিদাল্‌গো' নামক স্থানের গির্জায় রক্ষিত যীশু-মাতা মেরি বা মারিয়া-মাতাকে মেক্সিকোর আদিম জাতির রক্ষয়িত্রী জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এইরূপ নানা উপায়ে মেক্সিকোর আদিম জনগণ

এতদিন পরেও অন্ধ-ভাবে জাতীয় প্রকৃতির ও মানসিক প্রবণতার পথ ধরিয়া নিজ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; যে রোমান-কাথলিক ধর্ম তাহাদের সংস্কৃতির ঘাড়ের উপরে চড়িয়া বসিয়াছে, যাহা তাহাদের চিন্তা ও চর্য্যাকে না বুঝিয়া কেবল নির্বোধ-ভাবে ও নিষ্ঠুর-ভাবে ধ্বংস করিবার প্রয়াসই করিয়াছে, তাহার অনুমোদিত আত্মপ্রকাশ তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই ও হইতেছে না। স্পেনীয়দের শিক্ষায় এতাবৎ আমেরিকার প্রাচীন জাতি-গুলি নূতন কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারে নাই—পুরাতনকে হারাইতে তাহাদের বাধ্য করা হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে নূতনকে আপনার করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ভারত হইতে যাহা পাইয়াছিল, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে হইতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতের রামায়ণ ও মহাভারত এবং প্রাচীন যবদ্বীপ ইতিহাসের উপাখ্যান লইয়া তাহারা তাহাদের বিশিষ্ট কৃতিত্ব ছায়ানাটক ও নৃত্যনাটক সৃষ্টি করিয়াছে, শ্যাম, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শিল্প-কলা বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চীনদেশের কবিতায় ও চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও অন্য শিল্পে, বৌদ্ধ প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; এবং জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। আমরা কি রামায়ণ-মহাভারত-বিহীন যবদ্বীপ, বুদ্ধচরিত-বিহীন শ্যাম, অমিতাভ-অবলোকিতেশ্বর-মৈত্রেয় বিহীন চীনও জাপানের কথা ভাবিতে পারি? এমনি ভাবেই ভারত এই-সব দেশে নিজের সত্তাকে ইহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারের সঙ্গে একমাত্র ইউরোপে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রসারের কথা তুলিত হইতে পারে; এই প্রসার সম্ভবপর হইয়াছিল এই জন্যই যে, ইহুদী-মূল খ্রীষ্ট-ধর্ম বরাবরই আপস করিয়া চলিয়াছিল—প্রথমটায় গ্রীক দর্শন ও ইতালীয় বহুদেব-বাদের সঙ্গে, পরে উত্তর-ইউরোপের জাতিসমূহের পূজাপার্বণ ও ধার্মিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে; এবং খ্রীষ্টান ধর্মের বিকাশ ও প্রসার কোনও

জাতি-বিশেষের একার কৃতিত্বের ফল নহে—সমগ্র ইউরোপের জাতিবর্গ মিলিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, রূপে ও রসে ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

২

দেশ-জয় অথবা বাণিজ্যের পথ ধরিয়া সভ্যতার প্রসারের কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দোচীন ও দ্বীপময়-ভারতে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রসারও নিশ্চয়ই ভবেত ও ঐ-সব দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদানের পথেই ঘটিয়াছিল। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু (ব্রহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন) সভ্যতার ধারা, নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই—অনার্য্যদের সময় হইতেই—ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-ঘটিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ভারতের আর্য্য-পূর্ব যুগের অনার্য্য (দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক) উপাদান ও নবাগত আর্য্য উপাদান সম্মিলিত হইয়া, উত্তর-ভারতে পঞ্চনদ ও গঙ্গার দেশে, 'হিন্দু'-সংস্কৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল ('হিন্দু' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ সকলকেই বুঝাইতে ব্যবহার করা হইতেছে), খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শতক পূর্বে তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল। আর্য্যদের ভাষা—সংস্কৃত ও প্রাকৃত—এই সভ্যতার বাহন হইল, এবং ইহার বাহ্য রূপ বা আকার এবং সংগ্রন্থন হইল আর্য্যজাতির ছাঁচ লইয়া। এই নব-সৃষ্ট সংস্কৃতি, বর্ষায় নদীর জল যেমন কূল ভাসাইয়া দেয় সেইভাবে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া ভারতের সীমান্তের বাহিরের দেশগুলিতেও—ইন্দোচীন, দ্বীপময়-ভারত এবং মধ্য-এশিয়ার নানা দেশে—গিয়া পহুঁছিল, যেন অতি সহজ ভাবেই। মনে হয়, প্রথম প্রসারের সময়ে এই ব্যাপারে বড় একটা সচেতন চেষ্টা ছিল না। কিন্তু একথা বলিলে ঠিক হইবে না যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার, কোনও অন্ধ নৈসর্গিক শক্তির মত, কিংবা অজ্ঞান inertia বা জাড্যের মত, কোথাও বাধা পায় নাই বলিয়াই ঘটিয়াছিল। হিন্দু সংস্কৃতির প্রসারের পথে কোনও-না-কোনও প্রকারের বাধা যে আসিয়াছিল

তাহা নিঃসন্দেহ; চীনদেশে কখনও-কখনও বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখা দিত, তিব্বতেও এরূপ বিরোধ একাধিকবার প্রকট হইয়াছিল; অন্যত্রও নিশ্চয়ই হইয়াছিল, তবে তাহার তেমন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। কারণ, যেখানেই বাহির হইতে নূতন কোন চিন্তা বা রীতি আসে, সেখানেই স্থানীয় রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। এই-সব আপত্তি কাটাইয়া উঠিয়া তবে হিন্দু সংস্কৃতিকে নিজ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইয়াছিল। যাঁহারা ভারতের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলেন এবং যাঁহারা ভারতের বাহিরে উহার প্রসার করেন, তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায়, সচেতন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের মাটিতে বসিয়া নিদিধ্যাসন ও অনুশীলন দ্বারা যে চারিত্র্যের এবং পুরুষার্থের আদর্শে তাঁহারা পহুঁছিয়াছিলেন, তাহার বাণী স্বদেশের বাহিরের মানবগণের নিকট শুনাইবার জন্য একটী সুবোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার বশেই তাঁহারা বিদেশে-গমন করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শনের মূল হয় তো আর্য্যদের দেবতার সম্বন্ধে নৈসর্গিক কল্পনায় ও মানুষী ধারণায় এবং অনার্য্যদের বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ঐশী শক্তির সম্বন্ধে বিশ্বাসে গিয়া পহুঁছিবে, ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে পূজা হয় তো মূলে বর্বরদের শস্য-উৎপাদনের বা প্রজা-প্রজননের জন্য অনুষ্ঠিত কোনও যাদু-বিদ্যার প্রক্রিয়াই হইবে; কিন্তু যে-ভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে এগুলিকে হিন্দু ধর্ম-জীবনে আনা হইয়াছে, তাহাতে এগুলির রূপ বদলাইয়া দিয়া, একেবারে অন্য বস্তুতে উন্নীত করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটিয়াছিল এক মহান্ অনুপ্রেরণার বাতাবরণের মধ্যে; এই অনুপ্রেরণা হইতে জাত জীবনীশক্তি এখনও অমৃতরস-প্রবাহে প্রবাহিত। ভারতে এই মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তা-জগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ দেখা

দিল—উপনিষদ্, বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ব্রহ্মবাদ ও দেববাদ, ভক্তিবাদ ; এবং, বিশিষ্ট-রূপে ভারতের ভারতীয়ত্ব এইখানে দেখিতে পাই—সর্ব-জীবের প্রতি অহিংসার ভাব, জীব-মাত্রেরই জীবন-ধারণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া, জীবের অহিংস্যত্ব সম্বন্ধে এই বোধ, জৈন, বৌদ্ধ এবং পরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ-ভাবে গৃহীত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রে, গভীরত্বে এবং বিস্তৃতত্বে ভারতের আহৃত এই সকল ভাব-সমুদ্রের কাছে পঁহুছিতে পারে, এরূপ কম বস্তুরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণের সংযম ও তপস্যা, এবং জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসা, জৈন যতি ও বৌদ্ধ শ্রমণের সর্বজীবে করুণা ও মৈত্রীর সঙ্গে মিলিত হইল, এবং প্রায় সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের জনগণের পক্ষে এই সকল ভাব ও কর্মধারা, তৃষিতের নিকট প্রাণবারির মত আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের নিকট হইতে সাগ্রহে স্বাগত পাইল। মানবজাতির সহিত একটা আত্মীয়তা-বোধ, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই উদার মনোভাব, এবং সকল মানবের সুখ ও মোক্ষের জন্য তীব্রভাবে অনুভূত আকাঙ্ক্ষা—এই দুই মহাভাব এবং অনুপ্রাণনার বশে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শিক্ষক ও প্রচারকগণ ঋষিদিগের ও বুদ্ধদেবের বাণী লইয়া সুদূর এবং দুরধিগম্য দেশসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। এই অনুপ্রাণনার বলে তাঁহারা এদিকে পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে ও দ্বীপপুঞ্জে কতকটা স্থলপথে ও বেশীর ভাগ জলপথে প্রয়াণ করিলেন এবং মোন ও খ্মের এবং চাম, ও পরবর্তী কালের বর্মী ও শ্যামীদিগকে, ও তথা মালয় সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাবলীর অস্ট্রিক বা ইন্দোনেসীয় জাতিসমূহকে, সভ্যতায় দীক্ষিত করিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করিয়া দিলেন—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বাণী, দর্শন ও চিন্তা এবং ইতিহাস ও উপাখ্যানাদি দিয়া—বুদ্ধ-চরিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ দিয়া—তাহাদের বুদ্ধি ও কল্পনা উভয়ই জয় করিয়া

লইলেন ; ওদিকে তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমের ও উত্তরের দুরারোহ ও বিপৎ-সংকুল হিমগিরি এবং মরুদেশ অতিক্রম করিয়া শক, শুলিক, কুস্তন, ঋষিক কুচী প্রভৃতি জনগণের মধ্যে উপনীত হইলেন, তিব্বতে এবং মহাচীনে বা চীনদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দুই-চারিজন এমন কি কোরিয়া ও জাপানেও পঁহুছিলেন।

এইরূপে প্রাচীনকালে ভারত নিজে সত্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই সাধনা ও সিদ্ধি জীবনে পরমার্থ বলিয়া, শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া অপরকেও বাঁটিয়া দিবার নিষ্কাম ইচ্ছায় বা অনুপ্রেরণায় জানা ও অজানা নানা দেশে নিজের ভাণ্ডার ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারত হইতে বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন দেশে, মধ্য-এশিয়া, চীনে, ঈরানে ও ইরাকে, এই ভাবে উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের ও সাধনার প্রচার, সচেতন ভাবেই ঘটিয়াছিল, এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সাকাঙ্ক্ষ ও সাগ্রহ সহযোগিতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

এ কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গুরুগণ বিজয়ী এবং বিদেশী শাসক জাতির মানুষ-রূপে ঐ-সব দেশে যান নাই—শাসক জাতির লোকের যে কতকগুলি সহজে স্বীকৃত ক্ষমতা বা অধিকার অথবা দাবী থাকে, তাহা তাঁহাদের ছিল না—তাঁহাদের আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠতা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আসিয়াছিলেন প্রথমটায় ভারতীয় বণিক্‌দের সঙ্গে ; যদিও কোনও-কোনও স্থানে এরূপ ঘটিয়াছিল যে, উপনিবিষ্ট বা আগত ভারতীয়দের দুই-একজন ঐ-সব দেশের রাজনীতিতে যোগ দিয়া, ক্বচিৎ স্থানীয় রাজবংশে বিবাহ করিয়া, নিজেদের একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হইলেও, বৃহত্তর-ভারতের দেশের লোকেরা যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাহারা স্থানীয় অ-ভারতীয় লোকই ছিল, তাহাদের রাজারা ও অভিজাত-জনও স্থানীয় ছিল, ভারত

হইতে যায় নাই। ভারতীয রাজশক্তি সৈন্য-সামন্ত লইয়া ঐ-সব দেশ সংগ্রাম কবিযা বিজয় কবিবাব জন্য যায় নাই। একমাত্র খ্রীষ্টীয় এগারোব শতকে তমিল-দেশ হইতে বাজেন্দ্র চোলেব মালয় দেশ ও শ্যাম-দেশ জয় ছাডা, এবং তাহাব বহু পূর্বে বৌদ্ধপুরাণ মতে গুজবাট হইতে সিংহলে বিজয়সিংহেব অভিযানেব কথা ছাডা, এরূপ যুদ্ধেব দ্বারা জয়েব আব সংবাদ আমাদেব জানা নাই। স্থানীয় লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া, তাহাদের দেশ জোব কবিয়া দখল কবিযা, বিজেতৃসুলভ নানা অত্যাচাব ও উৎপীডন কবিয়া, তবে ভারতেব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। ভাবতবর্ষ হইতে কখনও ভাবতের বাহিবে কুরুষ বা কম্বুজিয়, আলেক্সান্দব বা যুলিউস্ কাএসার্, আত্তিলা বা গজনীব সুলতান মহ্মুদ্, চিঙ্গীজ্ খান বা তৈমূবলঙ্গ, কোর্তেস, পিসাবো অথবা নেপোলিযনেব মত, দিগ্বিজযী বীব বা যোদ্ধা ভাবত-সংস্কৃতির বৈজয়ন্তীকে বহন কবিয়া লইয়া যান নাই, ভারতেব দিগ্বিজয় ঘটিযাছিল সত্য এবং ধর্মেব সাহায্যে, অস্ত্রেব সাহায্যে নহে, বাজর্ষি অশোকের আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম-বিজয়েব আদর্শকেই ভাবতেব ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেই ভাবতেব অবিনশ্বর গৌবব, ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে যে, কাষায়-চীবব পরিধান কবিয়া বিনয়াবনত ভিক্ষু এবং কটিবস্ত্র মাত্র পরিহিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিব মত, চীন ও কম্বোজে, মধ্য-এশিয়া ও যবদ্বীপে গিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, এবং এই-সকল দেশে ও অন্যত্র ভাবতেব প্রাণশক্তির সঞ্চাব করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহাদেব চেষ্টায় একটী সত্যকাব 'বৃহত্তব-ভাবত' তাঁহাবা গডিয়া তুলিয়াছিলেন, যে বৃহত্তর-ভারত আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং ভৌতিক বা পার্থিব ব্যাপাবে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মানুভূতি ও শিল্পকলায়, ভারতবর্ষেব একটী বিস্তৃতি-স্বরূপই ছিল।

যে-সকল ভারতবাসী আবার স্বজাতির মধ্যে সুপ্ত বা ম্রিয়মাণ শক্তিকে

পুনরুজ্জীবিত করিতে উৎসুক, বৃহত্তর-ভারতের ইতিহাস, এশিয়া-খণ্ডে ভারত-সংস্কৃতির প্রসারণের ইতিহাস তাঁহাদের এই কাজে বল দিবে, অনুপ্রাণনা যোগাইবে,—যাহার ফলে জাতিকে আবার দাঁড় করাইয়া দিতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। ভারত প্রাচীনকালে সজ্ঞানে যাহা করিয়াছিল, তাহার আলোচনা, বিচার ও অনুধ্যান হইতে আমরা আধুনিক কালে আবার নূতন আশা ও উৎসাহ লাভ করিতে পারিব, নূতন করিয়া আমাদের কার্য্যস্পৃহা আনিতে পারিব, এবং আমাদের উপস্থিত অযোগ্যতার জন্য আমাদের মনে আবশ্যক দীনতা-ভাব এবং নম্রতাও আনিব। আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সহৃদয়গণের দৃষ্টি বৃহত্তর-ভারতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

প্রাচীনকালের ভারত নিজ জ্ঞান ও বিদ্যা এবং চিন্তা ও চর্য্যার কারণ এশিয়া-খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মানুষের মনে ও অনুভূতিতে কতটা শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধ চীন বা জাপানে অথবা শ্যাম বা যবদ্বীপ কিংবা অন্যান্য দেশে একবার গেলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ভারতীয় দর্শন, জীবনের নানা ব্যাপারে ও জীবনের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, এমন কি ভারতীয় আচার বা সদাচার, এই-সব জাতির লোকের মধ্যে এমন-ভাবে গৃহীত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে সেগুলি অনপেক্ষিত-ভাবে আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের চমৎকৃত করে। সিঙ্গাপুরে এক চীনা বৌদ্ধ বিহারে আমাদের বিহার-সংশ্লিষ্ট নিরামিষ ভোজনাগারে আহার করিতে অনুরোধ করা হইল, মাংসভোজী সর্বভুক্ শূকরমাংস-প্রিয় চীনাদের মধ্যে নিরামিষ আহারের রীতি বড়ই অসাধারণ বস্তু, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ইহা তাহাদের সাংস্কৃতিক বা ধার্মিক জীবনের মধ্যে নিজ সহজ স্থান করিয়া লইয়াছে। আহারান্তে, আমাদের ভোজনগৃহের পার্শ্বে একটী প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইয়া

গেল, সেখানে একটী বড জালায় জল আছে, হাতলওয়ালা মালায় করিয়া সেই জল তুলিয়া লইয়া আমাদের আঁচাইতে বলিল। ব্যাপারটী খুবই সামান্য, কিন্তু এই যে ব্যক্তিগত শৌচের আদর্শ, ইহা তো বৌদ্ধ মঠের বাহিরে আর কোথাও দেখি নাই—ভোজনের পরে এই মুখধাবন-রূপ শৌচের রীতি আমরাও যুগধর্মের ফলে অন্য পাঁচটী জাতির ছোঁয়াচে বর্জন করিতেছি, চীনাদের মধ্যে বোধ হয় ইহা তেমন সাধারণ ছিল না, কিন্তু চীনা বৌদ্ধ-চর্য্যা এখনও ইহা ধরিয়া আছে এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন ভারতেরই শৌচ-বিচারের জয়গান করিতেছে। আমার তখনই মনে পড়িয়া গেল, সপ্তম শতকের চীনা ভিক্ষু ঈ-ৎসিঙ-এর কথা—তিনি ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বইয়ে ভারতীয়দের অনুষ্ঠিত শৌচ ও সদাচার স্বজাতীয় ভিক্ষুদের শিখাইবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ।

দ্বীপময়-ভারতের লোকেরা বিগত ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়া, আমাদের দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ভারতের সঙ্গে যোগ হারাইয়াছে। বলিদ্বীপ বৃহত্তর-ভারতের একেবারে সুদূর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত—বলির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ইহার পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল মনে হয়। তবে যবদ্বীপের সঙ্গে বলিদ্বীপ বরাবরই সংশ্লিষ্ট ছিল। বলিদ্বীপের দশ লাখ লোক এখন প্রায় পূরাপূরি তাহাদের পৈতৃক হিন্দুধর্ম জীয়াইয়া রাখিয়াছে, যবদ্বীপের চারি কোটি লোকের মত তাহারা অন্ততঃ বাহিরেও মুসলমান বনিয়া যায় নাই। বলিদ্বীপে এখন যে হিন্দুধর্ম বিদ্যমান, ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য (শৈব) ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম স্থানীয় লোকেদের আদিম ধর্মের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যাইবার ফলে, তাহা একটী বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে—তাহাকে হিন্দু ধর্মের বলিদ্বীপীয় বিকাশ বলিতে হয়। ভারতের লৌকিক হিন্দুধর্ম—ইহার দেব-কাহিনী ও পুরাণ-কথা, ইহার সাড়ম্বর পূজা, প্রেতকৃত্য, শ্রাদ্ধ ও অন্য অনুষ্ঠান, ইহার

মধ্যে উৎসবাত্মক ও নয়নরঞ্জক যাহা কিছু আছে, তাহা, এবং ইহার অতিপ্রাকৃত দিক্,—আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই-সবই যেন বলিদ্বীপের আদিম ইন্দোনেসীয় লোকেদের মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং এই-সবই তাহারা নিজেদের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ হইতে গৃহীত নানা দেব-কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য পূজা বা দেবার্চনা রীতি, শবদাহ-রীতি ও শ্রাদ্ধ এবং অন্য অনুষ্ঠান, এবং বলিদ্বীপের ইন্দোনেসীয় সংস্কৃতির অনুযায়ী করিয়া সেগুলির পরিবর্তন—এই-সব বলিদ্বীপে এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। হিন্দু পূজার্চনার অনুষ্ঠান, ভারতে অজ্ঞাত নূতন কতকগুলি পদ্ধতির সঙ্গে মিলিত হইয়া, এই দ্বীপে বেশ একটু অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে, পূজার তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি বিকৃত সংস্কৃতে ও বলিদ্বীপের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হয়। ভারতের পূজার মন্ত্রপূত জল, পুষ্প, ঘণ্টা, আসন, মুদ্রা এই-সবের সঙ্গে বহু বলিদ্বীপীয় আচার ও উপচার মিলিত হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে মনে হইবে, বুঝি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহিরঙ্গ, পূজা-অর্চনার ঘটা, প্রদক্ষিণ ও চংক্রমের আড়ম্বর—এক কথায়, দেবার্চনার নাটকীয় এবং দর্শনীয় বস্তুগুলিই—ইহাদের অভিভূত করিয়াছে, কেবল সেইগুলির জন্যই ইহাদের শিশুসুলভ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এদেশের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর দুই চারিজন ব্যক্তির সহিত আলাপে বুঝিলাম, এই ধারণা ঠিক নহে। আড়ম্বর ও ঘটা এবং অতিপ্রাকৃতের বাহুল্য ইহাদের মনকে সরস করে বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ যে-সমস্ত গভীর তত্ত্বকথা বলিয়া গিয়াছেন, সেগুলিও ইহাদের মনে বিশেষ একটা স্থান করিয়া লইয়াছে—ইহাদের মধ্যেও শাশ্বত, সত্য তত্ত্ব এবং তথ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও অন্তর্মুখিতা যথেষ্ট আছে।

১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলিদ্বীপে গিয়াছিলাম, তখনকার একটী ঘটনার কথা বলিব। পূর্ব-বলিতে ছোট একটী

শহর, কারাঙ্-আসেম, সেখানকার stedehouder (অর্থাৎ নগরপাল) এই ডচ্ উপাধিধারী বৈশ্য-জাতীয় রাজা অনাক্ আগুঙ্ বাগুস্ জলান্তিক্-এর গৃহে কবি অতিথি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার অনুচর-রূপে সেখানে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণ ও অন্য হিন্দুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে জানিয়া, আমি দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ে তাহাদের দেখাইবার জন্য এক প্রস্থ পূজার তৈজস-পত্র ও অন্য জিনিস লইয়া গিয়াছিলাম, সঙ্গে নিজের সুবিধার জন্য একখানি 'পুরোহিত-দর্পণ'ও লইয়া যাই। ভারতবর্ষ হইতে আগত ব্রাহ্মণ আমি—আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য রাজা তাঁহার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ('পদণ্ড' অর্থাৎ দণ্ডী বা দণ্ডধারীদের) ডাকিয়া আনাইলেন। সঙ্গের একজন ওলন্দাজ বন্ধু দোভাষীর কাজ করিলেন, তাঁহার সহায়তায় একদিন প্রায় সারা সকাল ও বিকাল ধরিয়া ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। আমার বক্তব্য আমি ইংরেজীতে বলি, ওলন্দাজ বন্ধু তাহা 'দ্বীপময়-ভারতের হিন্দী' মালাই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের বলেন, তাঁহাদের মালাই বক্তব্য আবার আমায় ইংরেজী করিয়া শুনান। রাজা সারা ক্ষণ বসিয়া-বসিয়া সব শুনিলেন ও দেখিলেন। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মনোমত সব বিষয় লইয়া আলোচনা চলিল। আমাকে আমাদের দেশের সাধারণ পূজার আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া সব মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বুঝাইতে হইল—'পুরোহিত-দর্পণ'খানি তখন বিশেষ কাজে লাগিল। সঙ্গে ভারতের মন্দিরের ও দেবমূর্তির অনেকগুলি ল্যাণ্টার্ন-স্লাইড ছিল—বলিদ্বীপে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন কোথাও মিলে নাই—সেগুলি হাতে-হাতে ঘুরিতে লাগিল, তাহা আলোর সামনে ধরিয়া সকলে ভারতের দেবমন্দিরের সম্বন্ধে একটু ধারণা করিবার চেষ্টা করিলেন। পদণ্ডরা ভারতের হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ, স্বগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

আমিও বলিদ্বীপে হিন্দুধর্মের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কিছু-কিছু খবর লইলাম। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্য সংস্কৃত বই সম্বন্ধে, সংস্কৃত-চর্চার পুনরভ্যুত্থানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা কহিলাম। কারাঙ-আসেম-এর রাজা স্বধর্মনিষ্ঠ ও পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত মালাই ভাষায় একখানি বই প্রকাশিত করিয়াছেন, বলিদ্বীপে প্রচলিত হিন্দুধর্মের স্বরূপ তাহাতে বর্ণনা করিয়াছেন (এই বই একখণ্ড তিনি আমাকে উপহার দেন), তিনি বেশ বুদ্ধিমানের মত আমাদের কথার মাঝে-মাঝে যোগ দিতেছিলেন। এইভাবে, প্রায় একটী পূরা দিন ইঁহাদের সঙ্গে কাটাইবার পরে, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামিতেছে, তখন রাজবাটীর মধ্যে একটী দীঘীর ধারে এক উচ্চ ছত্রীযুক্ত ঘরের মধ্যে আমাদের যে আলোচনা-সভা চলিতেছিল, সেই সভা ভাঙ্গিবার সময়ে, রাজা হঠাৎ আমাকে একটী প্রশ্ন করিলেন: 'দেবতা, শ্রাদ্ধ, দেবার্চনা, সামাজিক রীতি—এ-সব নিয়ে তো অনেক কথা হ'ল, এখন বলুন তো, মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য কি?' প্রশ্নটী রাজা যেরূপ গভীর ও আন্তরিক ভাবের সহিত করিলেন, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম—হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; কয়দিন যাবৎ বলিদ্বীপে ঘুরিয়া আমাদের মনে হইতেছিল—আর এদেশে বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছেন এমন শিক্ষিত ডচ্‌ লোকেও আমাদের সেই কথা বলিতেছিলেন—যে, এই বলিদ্বীপের ইন্দোনেসীয় জাতি হিন্দু সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া কেবল উপর-উপর মাত্র পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের মূল প্রকৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনও ছাপ পড়ে নাই, ভারতের চিন্তার গভীরতা তাহাদের কাছে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। নাচগান, নাটক, পূজার ঘটা লইয়াই তাহারা খুশি। ধর্মের ও জীবনের বহিরঙ্গ লইয়া সারাদিন ধরিয়া বকাবকির পরে, এই অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা বড়ই ভাল লাগিল। আমি নিজে উত্তর না দিয়া, ডচ্‌ বন্ধুর

মারফৎ রাজাকে অনুরোধ করিলাম, তিনি নিজেই তাঁহার প্রশ্নের সমাধান করুন। তখন রাজা বলিলেন, দেবতা এবং দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ এবং স্বর্গবাস —এ-সমস্ত কিছুই নহে, জীবনের বা ধর্মের গভীরতম ব্যাপার এগুলি তো নহে; মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, মানুষের পুরুষার্থ, হইতেছে, নির্বাণের সাধনা। রাজা মালাই ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, বলিদ্বীপীয় উচ্চারণে তাঁহার কথার শেষ দুটী বাক্য এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—'ডেওআ-ডেওআ টিডাঃ আপা, নিরওআনা সাটু' (Dewa-Dewa tidak apa, Nirwana satu), অর্থাৎ 'দেবতারা—এঁরা কোনও কাজের নয়, একমাত্র নির্বাণ।' সুদূর দ্বীপময়-ভারতের পূর্বতম প্রান্তে ভারতের সংস্কৃতির মূল কথা যে লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই, তাহা দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম; মূল কথা এই যে, নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনই হইতেছে দুঃখ-নিবৃত্তির চরম উপায়, মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য। হাজার বছরের উপর হইল, ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ নাই, তথাপি এ কথা তাহারা ভুলে নাই। পরে রাজার এই প্রশ্নের কথা এবং তাঁহার উত্তরের কথা রবীন্দ্রনাথকে বলি, এবং তিনি শুনিয়া খুব খুশি হন। তিনি আমাকে বলেন—'এরা মালাই জাতির লোক, এদের চিন্তাজগৎ আমাদের থেকে আলাদা, খুব সম্ভব এরা ভারতের সভ্যতার বহিরঙ্গের জাঁকজমক দেখেই প্রথমটা আকৃষ্ট হয়, আমাদের পুরাণ-কথা আর শিল্প এদের বেশী ক'রে মুগ্ধ করে, কিন্তু রাজা যে ভাবে কথাটী ব'লেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিকমত আর ভাবশুদ্ধির সঙ্গে ধ'রতে পেরেছে। আর তা না হ'লে এতদিন ধ'রে এরা নিজেদের হিন্দু ধর্মকে এত শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারত না, তাদের চতুর্দিকে এত প্রতিকূল শক্তি সত্ত্বেও।'

বলি আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ হইবার পরে, রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপ সম্বন্ধে

একটী অতি চমৎকার কবিতা লেখেন, যেটী "বালী" এই নামে 'প্রবাসী'তে ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়; বহুদিন পরে কবি তাতে একটী পুরাতন ছন্দ ব্যবহার করেন। এই কবিতাতে ভারতবর্ষ যেন এক রাজকুমার, সুদূর দ্বীপে সাগরতীরে কুমারী-রূপিণী বালী বা বলির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, তাহার পরে তাহাদের মিলন, আর শেষে বালীর সঙ্গ ছাড়িয়া রাজকুমার-রূপী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বহু দিন পরে কবির মধ্যেই আত্মবিস্মৃত ভারত আবার রাজকুমারী বালীর দ্বীপে আসিয়া পহুছিয়াছে, তরুণী বালীকে দেখিয়া পূর্বকথা মনে পড়িতেছে। কারাঙ-আসেমের রাজার কথায় প্রকাশিত বলিদ্বীপের আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা কবি এইভাবে কবিতাটীতে লিখিয়াছেন—

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্ খানে
উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ' তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ ধরি', যুগল করি' পাণি॥ *

---

* এই কবিতাটী 'সাগরিকা' নামে 'পূরবী'তে পুনঃপ্রকাশিত হয়, এবং পরে 'সঞ্চয়িতা'তেও এটী স্থান পায়। কি কারণে জানি না, 'পূরবী'তে ও 'সঞ্চয়িতা'তে এই ছত্রকয়টী বাদ দেওয়া হইয়াছে। কবির কাছে এ জন্য অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলাম, তিনি পরে ছত্রকয়টী পুনরায় সন্নিবেশিত করিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই। আমার মনে হয়, এই ছত্র কয়টী বাদ দিলে কবিতাটীর বলিদ্বীপ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গটুকু অসম্পূর্ণ থাকে, একটু রসহানিও ঘটে।

মহাযোগী শিব ও বুদ্ধ—ইঁহাদের দেশিত এই মোহ-মোচন বাণী, ভারতবর্ষ বাহিরের জগতে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মানব মনে-প্রাণে তাহা গ্রহণ করিয়া, ভারতের সঙ্গে মিলিত ভাবে তাহার সাধনা করিয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ অবদান ; ভারতের অনুপ্রাণনায় যে পার্থিব সভ্যতা বাহিরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার চেয়ে ইহার মূল্য অনেক অধিক।

ভারত কি নিজ জীবনে এই বাণীকে আবার কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিবে, যাহাতে সে তাহার পূর্ব-রীতিতে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-মিত্র রূপে, জীবনে শ্রেয়ের সন্ধানে সহায়ক হইয়া, বিশ্ব-মানবের সেবা করিয়া আবার ধন্য হইতে পারিবে ?

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ বিহার

ব্রহ্মদেশের যে কোনও নগরে বা গ্রামে গেলে, প্রায়ই একটী জিনিস নজরে পড়ে—ঘণ্টাকৃতি বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া—সাধারণতঃ স্বর্ণমণ্ডিত—তাল বা নারিকেল এবং অন্য তরুর গহন হরিৎশোভার মধ্যে উন্নতশীর্ষে নীল আকাশের ক্রোড়দেশে নিজ উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জাহাজে করিয়া রেঙ্গুনে আসিবার কালে রেঙ্গুন-নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিবার কিছু পরেই, দূর হইতে রেঙ্গুনের সুউচ্চ শোয়ে-ডগোন চৈত্যের চূড়াস্বরূপ স্বর্ণময় দগব বা ধাতুগর্ভের উপরে প্রতিফলিত সূর্য্যের ঝলক সকলেরই চিত্তকে উৎসুক করিয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসাদে যে স্থাপত্যাদি শিল্পরীতি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে আনীত হয়, তাহা, ব্রহ্মদেশীয় মোন্ বা তালৈঙ এবং ম্রন্‌মা বা বর্মী এই দুই জাতির ধ্যান-ধারণা ও সাধনা এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া, একটু স্বতন্ত্র ধরণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্রহ্মে ভারতের স্থাপত্যের ক্রমবিবর্ধমান স্বাধীন গতি, বিভিন্ন যুগের মন্দিরের গঠনপ্রণালী আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সে যাহা হউক, বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে লতাচিত্রাদি-অলঙ্করণবিহীন, নিরাভরণ অথচ স্বর্ণমণ্ডিত বৌদ্ধ চৈত্যের চূড়াভাগ, ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ও অন্তর্মুখী দিকের প্রতীক-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের চোখের সামনে প্রসন্ন আকাশের গায়ে রৌদ্রের মধ্যে ঝলমলে' সোনার-পাত-মোড়া ঘণ্টাকার এই প্রকার চৈত্য-চূড়াই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী করিয়া ভাসিয়া থাকে। এই Symphony in blue, green and gold—নীল সবুজ আর সোনার এই সংবাদী বা ঐক্যতান সঙ্গীতে—ইহাই যেন ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট স্মৃতি-স্বরূপ চিত্তপটে উদিত হয়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ, এবং পরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় মতের তান্ত্রিক—এই তিন প্রকারের ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্রহ্মদেশে গিয়া পঁহুছিয়াছিল, এবং প্রাচীন ব্রহ্মের তিনটী বিশিষ্ট জাতি 'মেঁঞ' (আধুনিক মোন্ বা তালৈঙ্—দক্ষিণ- ও মধ্য-ব্রহ্মের অধিবাসী), 'প্যু' (অধুনালুপ্ত মধ্য-ব্রহ্মের অধিবাসী), ও 'ম্রন্‌মা' (আধুনিক বর্মী, উত্তর-ব্রহ্ম হইতে আগত)—ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও 'আর্য্য'-নামধারী তান্ত্রিক গুরুদের নিকট হইতে ঐ তিন মত গ্রহণ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রহ্মদেশের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা অনিরুদ্ধ (আনোয়াঠা বা নোযাঠা) ও তৎপুত্র ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ ক্যন-চচ্-সাঃ (বা চ্যান্‌-জ্বিৎ-থা), ইঁহাদের আগ্রহে, এবং ইঙ-অরহং (বা শিন্‌-আয়াহান্) নামক বৌদ্ধ ধর্মগুরুর চেষ্টায়, হীনযান মার্গের শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে সুস্থাপিত হয়। তখন হইতে, দেশে বহু-প্রচলিত তান্ত্রিক ধর্মের, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম বর্মীদের মধ্যে পঁহুছিবার পূর্বে উহাদের মধ্যে যে আদিম ধর্ম ছিল সেই ধর্মের, পতন ঘটিতে থাকে, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মও ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে, ক্রমে তান্ত্রিক ধর্মের প্রায় বিলোপ-সাধন হয়। বর্মীদের আদি ধর্ম, বিভিন্ন 'নাৎ' বা দেবযোনির পূজা, এখন বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া, অপ্রকাশ্যে টিঁকিয়া আছে, এবং স্থানীয় 'পোনা' বা ব্রাহ্মণদের আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ক্ষীণধারায় এখনও প্রবাহিত আছে। কিন্তু আধুনিক বর্মী জাতির চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে এই হীনযান-মতের বৌদ্ধ ধর্ম।

আদিম বর্মীজাতি সভ্যতার নিম্ন স্তরেই ছিল—ইহাদের আত্মীয় চীনারা এবং প্রতিবেশী ভারতীয়েরা নিজ চেষ্টায় উন্নতির যে শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, বর্মীরা তাহাদের আদিম অবস্থায় তুলনায় নিতান্ত বর্বরই ছিল। বর্মী চরিত্রে নানা সদ্‌গুণ আছে—আবার কতকগুলি অবগুণও আছে। সাহস, সঙ্ঘবদ্ধতা, স্বজাতি-প্রীতি ও সমাজ-প্রীতি, উৎসাহশীলতা,

কৌতুহল, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব, এবং চিত্তপ্রসন্নতা ও রসবোধ—এগুলি ইহাদেব মানসিক সদ্‌গুণের মধ্যে অন্যতম ; এবং অবগুণের মধ্যে উল্লেখ কবিতে পারা যায়—নিষ্ঠুবতা—অপরেব ক্লেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, গাম্ভীর্য্যের ও গভীরতার অভাব, দর্শন ও বিচাবশক্তির অল্পতা, বিলাসপ্রিয়তা।

নিষ্ঠুরতা বর্মী চবিত্রের একটী কলঙ্ক ছিল। এখনও হঠাৎ রাগিয়া উঠিলে ইহাদের চরিত্রে এই অবগুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সেদিন পর্য্যন্ত বাজদ্রোহেব সাজা দিবার জন্য বাঁশেব বা কাঠেব আড়গড়ার ভিতর পুবিয়া, শতশত নবনাবী ও শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ করাব বেওয়াজ বর্মীদের মধ্যে ছিল। নূতন শহরের পত্তনেব সময়ে বর্মীদের মধ্যে Myosade 'মিওসাডে' বলিয়া এক নৃশংস পদ্ধতি ছিল, তদনুসারে শহরের বহিঃ-প্রাচীবের কোণে-কোণে এবং তোরণগুলির নীচে জীয়ন্ত মানুষ প্রোথিত হইত—পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই 'মিওসাডে'ব জন্য প্রশস্ত বলি বলিয়া বিবেচিত হইত। উদ্দেশ্য ছিল, এই সব নিহত ব্যক্তিগণ প্রেত বা যক্ষ হইয়া শত্রুর হস্ত হইতে নগব রক্ষা করিবে। ১৮৫৭ সালে যখন বাজা মিণ্ডোন্-মিন্ মাণ্ডালে নগর স্থাপিত কবেন, তখন নাকি বাহান্ন জন নিরপরাধ নরনারীকে এইভাবে বধ কবা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বরাববই এই-সব বর্বরতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। তাঁহারা এই সমস্ত নিষ্ঠুবতা ও আদিম অন্ধবিশ্বাস দূব কবিবার জন্য বহুবাব সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মের মণিপুবী ব্রাহ্মণগণ 'মিওসাডে'ব নববলিব সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, এরূপ শোনা যায়। বর্মীদেব জ্ঞাতি শান্‌দিগের মধ্যে রাজাদের মৃত্যুব পরে তাঁহার দাহেব সময়ে তাঁহাব বহু অনুচরকে নিহত করা হইত—পবলোকে গিয়া তাঁহার সেবা কবিবার জন্য। শান্‌দের এক শাখা আহম জাতি ১২২৮ সালে আসাম জয় করে, ইহাদের মধ্যেও এই নিষ্ঠুব প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ব্রহ্মের রাজা বায়িন্-নৌঙ শান্‌দেশ জয় করেন,

এবং শান্‌দের মধ্যে এই নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা বন্ধ করিয়া দেন—তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে বর্মার শানেদের ভিতর হইতে এই বর্বরতা উঠিয়া গিয়াছে। আসামের শান্ আহমরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আসামে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবও তাহাদের মধ্যে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে কতকগুলি করিয়া নিরপরাধ নরনারীর হত্যা বন্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়া ভারতের মনের প্রভাব বর্মায় পঁহুছিয়া, বর্মী জীবনের অনেক আদিম বর্বরতাকে এইভাবে অবলুপ্ত বা সংস্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের জীবনের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, গভীর ও অন্তর্মুখী, সুকুমার ও উচ্চভাবের পরিপোষক, তাহার কেন্দ্র হইতেছে দেশের নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শত-শত বৌদ্ধ kyaung চ্যঙ বা বিহার। এখনও বর্মার জীবনে চ্যঙের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্মীরাও নিজেদের জীবনে প্রায় সব বিষয়েই চ্যঙের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। এখনও ভিক্ষুরাই সব বিষয়ে নেতা—চিন্তা ও ভাবজগতে তো বটেই। মন্দির ও বিহারকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের সামাজিক ও উৎসবময় জীবনের যত-কিছু সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত উৎসবে গ্রামের ও নগরের লোকজন মন্দিরেই সমবেত হয়; মন্দিরের আঙ্গিনায় তখন Pwe 'পুয়ে' নাট্যশালা খোলা হয়, সারারাত ধরিয়া নরনারী নানা প্রকারের 'পুয়ে' দেখে, উৎসবের জন্য স্থাপিত ভোজনশালায় পান-ভোজন করে,—'পুয়ে'র মারফৎ একাধারে নিজ ধর্মের ও নিজ জাতির ইতিহাসের কাহিনীগুলি শুনে ও দেখে, এবং সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আনন্দ পায়। সারা বছর ধরিয়া ভিক্ষুরা বিহারে পাঠশালা খুলিয়া রাখেন, গ্রামের বা পল্লীর ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া শিখে; এই ভাবে ব্রহ্মের বিহারগুলির দ্বারা জন-সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিতরণ আবহমানকাল ধরিয়া

চলিয়া আসিয়াছে, এবং ইহার ফলেই লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। প্রত্যেক বর্মী বালককে মাস কয়েকের জন্য মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া চ্যঙ-এ গিয়া ভিক্ষুব্রত পালন করিতে হয়—দেশের ধার্মিক ও নৈতিক এবং মানসিক সংস্কৃতির মুখ্য ধারার সঙ্গে এইভাবে তাহাদের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। প্রাচীন-কালে এই বিহারগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র কেন্দ্র ছিল। এখনও এখানে ভিক্ষুরা পালির চর্চা করেন, পাঠার্থীরাও পালি পড়িতে পারে। ব্রহ্মের ভিক্ষুরা চ্যঙ্-এ বসিয়া-বসিয়া বিগত কয়েক শতকের মধ্যে পালি ভাষায় একটা বেশ বড় সাহিত্যও রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন—ভারতের ও সিংহলের মূল পালি সাহিত্যের একটা জের বা ধারা হিসাবে, শ্যাম ও কম্বোজের পালি-সাহিত্যের সঙ্গে ব্রহ্মের পালি-সাহিত্যেরও নাম করিতে হয়। সংসার-ধর্ম করিতে-করিতে জীর্ণদেহ ও ক্লান্তমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয়স্থান এই বিহারগুলি—আমাদের হিন্দু-সমাজে যেমন কাশী বৃন্দাবন পুরী নবদ্বীপ, সংসার-তাপে তাপিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শেষ আশ্রয়স্থান হইয়া থাকে। আবার অগ্নিদাহাদি দৈবদুর্বিপাকের ফলে গৃহহীন লোকেরা এই-সকল মন্দির ও বহারে সাময়িক আশ্রয় পাইয়া, যথার্থ 'দেউলিয়া' বা দেবকুলবাসী অনাগারিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারে। পথিক ব্যক্তির পক্ষে চ্যঙ-এর আশ্রয় অবারিত, পান্থদের জন্য চ্যঙ-গুলিই ধর্মশালার কাজ করে।

ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে প্রত্যুষে একটী সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়—চ্যঙ হইতে ভিক্ষু ও শ্রামণেরগণ (অর্থাৎ ভিক্ষুদের ছোকরা চেলারা) মন্দিরের সোনালী রঙের চূড়ার মতই পীত-কাষায় বাস পরিধান করিয়া কালো রঙে রঙ্গানো কাঠের পিণ্ডপাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। গৃহস্থের কিংবা দোকানীর দ্বারে দাঁড়াইলেই যাহার যাহা সাধ্য কিছু খাদ্য-

দ্রব্য দিতেছে। পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ভাত-তরকারী অথবা চাউল ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চ্যঙ-এ প্রত্যাবর্তন করে। প্রাচীন কালে এই ভিক্ষালব্ধ খাদ্য হইতেই ভিক্ষুদের আহার হইত,—দ্বিপ্রহর অর্থাৎ বেলা বারোটার পূর্বে তাঁহারা একবার ভরপেট খাইয়া লইতেন, দ্বিপ্রহরের পরে বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রে ফলের রস ছাড়া আর কিছুই খাইতেন না। এখন সাধারণতঃ চ্যঙ-গুলির ভাল আয় থাকায়, ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের উপর ভিক্ষুদের নির্ভর করিতে হয় না,—ভিক্ষুর কর্তব্য হিসাবে মাধুকরী ভিক্ষা অবলম্বন করা হয় বটে, কিন্তু প্রাপ্ত খাদ্যাদি প্রায়ই গরীব দুঃখী ও রাহী লোকেদেরই দেওয়া হয়—ভিক্ষুদের সেবার জন্য চ্যঙ-এই পৃথক্ রান্না হয়, ভিক্ষুরা তাহাই খান। নূতন-নূতন চ্যঙ বানাইয়া দেওয়া ও চ্যঙের ভিক্ষুদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বা তাঁহাদের আরামে থাকিবার জন্য, এবং চ্যঙ-এর ও মন্দিরের সৌষ্ঠব তথা ছাত্রদের পাঠাদির খরচের জন্য টাকা দেওয়া, কি ধনী কি দরিদ্র সাধারণ বর্মী গৃহস্থ সকলেই পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করেন। 'চ্যঙ্-তগা' অর্থাৎ 'বিহার-প্রতিষ্ঠাতা', এই উপাধিটী এতটা কাম্য যে, সাধারণতঃ বয়স্থ বর্মী পুরুষকে খাতির করিয়া 'চ্যঙ্-তগা' বলিয়া আহ্বান বা উল্লেখ করা হয়। মন্দির ও চ্যঙ-কে সুন্দর করা, আলোকমালাদ্বারা সজ্জিত করা, বর্মীদের এতটা বেশী রোচক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, মাণ্ডালের এক সর্বজনমান্য বৃদ্ধ-ভিক্ষুর চেষ্টায় বর্মার প্রায় তাবৎ নগর ও গ্রামের বড়-বড় বৌদ্ধ মন্দিরগুলি বিজলীর বাতিতে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে;—হয় তো শহরে বা গ্রামে বিজলীর বাতি যায়-ই নাই, কিন্তু বিশেষভাবে ডাইনামো বসাইয়া মন্দিরে-মন্দিরে বিজলীর আলোর মালা মন্দিরগাত্রে ও চূড়ায় সারারাত ধরিয়া জ্বলিয়া থাকে, এবং এইরূপে নিস্তব্ধ নিশীথে নক্ষত্রখচিত আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বৌদ্ধধর্মের মহিমা আলোকমালার দ্বারায় বিঘোষিত হয়।

বর্মার বৌদ্ধমন্দিরে পাণ্ডার উৎপীড়ন নাই। ফুলওয়ালীরা ও বাতি-ওয়ালীরা বুদ্ধমূর্তির সামনে উৎসর্গের জন্য ফুল ও বাতি কিনিতে আহ্বান করে; এবং মন্দিরের আঙ্গিনায় কোনও এক কোণে ঘণ্টা বাজাইয়া হয় তো মন্দিরের কার্য্যকরী সমিতির তরফ হইতে কেহ চাবি-দেওয়া দানের বাক্সের সামনে দাঁড়াইয়া, মন্দিরের খরচ চালাইবার জন্য কিছু দান করিবার জন্য যাত্রী, পূজক ও দর্শকদের আহ্বান করিতেছে, ইহা দেখা যায়, কিন্তু কোনও পীড়াপীড়ি নাই। মন্দিরের মধ্যে—'মন্দির' বলা ঠিক নহে, বিরাট চৈত্যের গায়ে—চারিদিকে বসা বুদ্ধমূর্তি আছে; তা ছাড়া, ছোট বড় কুলুঙ্গীতে ও নাটমন্দিরে শোওয়া বসা দাঁড়ানো রকমারি আকারের সোনার-পাত-লাগানো কাঠের, অথবা শ্বেতবর্ণ মর্মর-প্রস্তরের বুদ্ধমূর্তি আছে, ইচ্ছামত সেগুলিরও সামনে গিয়া মন্ত্রপাঠ করা যায়, নিঃশব্দে ধ্যান বা পূজা করা যায়, ফুল ও বাতি অর্পণ করা যায়।

মন্দিরের সংলগ্ন, অথবা সম্পূর্ণ পৃথক-ভাবে অবস্থিত 'ফুঙ্গী' বা 'ফুঙ্গী চ্যাঙ' বা ভিক্ষুদের আবাসস্থান বিহার। স্বয়ং বিহার-স্থাপয়িতা, অথবা বিহারে বাস করে এমন বিশিষ্ট পূজ্যপাদ ভিক্ষুর অনুরক্ত শিষ্যেরা, নানাভাবে বিহারটীকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

বিহারগুলি সাধারণতঃ প্রশস্ত হাতার মধ্যে হয়; এই হাতার মধ্যে সমাগত যাত্রী বা শিষ্যদের বসিবার ও থাকিবার জন্য বড়-বড় কতকগুলি চালাঘর থাকে, গ্রামের উৎসব সভা ইত্যাদিও এই-সব চালাঘরে হইয়া থাকে। আধুনিকভাবে সজ্জিত, মায় লোহার খাট ও মূল্যবান্ আলমারী টেবিল চেয়ার সমেত প্রকোষ্ঠ থাকে ভিক্ষুদের বাসের জন্য; বিহারে যে-সব ছাত্র পড়িতে আসে, তাহাদের জন্যও ঘর থাকে; পৃথক্ রান্নাঘর, খাইবার জায়গা। গরীব বিহারে এতটা ঘটার ব্যবস্থা থাকে না,—ভিক্ষুরা বর্মী ধরণের দ্বিতল বাটীর কাঠের পাটাতনের মেঝের উপরে

মাদুর পাতিয়া শয়ন করেন, সেখানেই বসিয়া-বসিয়া নিজেরা ধ্যান-জপ ও পড়াশুনা করেন, ছেলেদের পড়ান। কিন্তু সব বেশ পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে', শহরের বা গ্রামের কোলাহল হইতে দূরে স্থাপিত শান্তিময় স্থান। প্রাচীন-কালে, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি ও নিষ্ঠুর বীভৎস হত্যার তাণ্ডবলীলার মধ্যে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে এই বিহারগুলিই একমাত্র শান্তি ও সচ্চিন্তার, বিদ্যা ও শিল্পকলার আশ্রয়-নিকেতন ছিল।

১৯৩৯-১৯৪০ সালে বর্মায় তিন সপ্তাহ আন্দাজ থাকিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, কিন্তু তিন-চারিটী ছাড়া চ্যঙ বা বৌদ্ধ-বিহার দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। মাণ্ডালের বিখ্যাত Queen's Golden Monastery অর্থাৎ 'রাণীর তৈয়ারী সোনা-মোড়া চ্যঙ' দেখিতে যাই—বিহারটী বিগত শতকের বর্মী কাষ্ঠময় বাস্তুশিল্পের একটী অতি সুন্দর নিদর্শন, এই হিসাবে ইহার প্রধান আকর্ষণ। মাণ্ডালের কাছে মাণ্ডালে-পাহাড়ের উপরে কতকগুলি নূতন বৌদ্ধমন্দির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বিহারও স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে বৌদ্ধ পুস্তকাগার ও পাঠনিরত কতকগুলি বর্মী ছাত্র ও ভিক্ষুকেও দেখিলাম—ইহারা উবুড় হইয়া শুইয়া-শুইয়া লেখাপড়া করিতেছে। এই দুই জায়গায় ভিক্ষুদের সঙ্গে কথাবার্তার বা আলাপ আলোচনার সুযোগ হয় নাই—যদিও বাহির হইতে ইঁহাদের জীবনযাত্রা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার রীতির কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

মধ্য-বর্মায় Pyinmana পিন্‌মানা শহরে দুই-চারি দিন অবস্থান করি, সেখানে স্থানীয় উকিল, আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত শান্তিময় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে দুইটী চ্যঙ ভাল করিয়া দেখিবার ও ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাতে তিনি আমাকে Kan U Kyaung 'কান্‌-উ-চ্যঙ' নামে একটী বিহার দেখাইতে লইয়া যান। বিহারটী একটু উঁচা টিলা জায়গায় স্থাপিত। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া জুতা

খুলিতে হইল। বিহারে ভিক্ষুদের কিন্তু জুতা পরিতে বাধা নাই—তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বর্মী চাপ্লি পরিয়া বেড়াইতেছেন। সকাল সাড়ে-সাতটা আন্দাজ সময়ে গিয়াছিলাম, ঘাসের শিশির তখনও শুখায় নাই। একজন ছোক্‌রা ভিক্ষুকে দেখিলাম, শান্তি-বাবু বর্মীতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা চ্যঙ দেখিতে পারি কি না। সে আমাদিগকে একটী দ্বিতল বাটী দেখাইয়া দিল। নীচের তলায় খালি একটী হল-ঘরের মতন। সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলাম। উপরে একটী বিরাট হল, তাহার মধ্যে মাথার চেয়ে একটু উঁচু কাঠের দেওয়াল দিয়া কতকগুলি কামরা করা হইয়াছে; এক-একটী কামরা এক-একজন সম্মানিত ভিক্ষুর থাকিবার স্থান। মাঝে খানিকটা জায়গা খালি আছে, তাহাতে দেওয়ালের আশ্রয়ে একটী বেদী, বেদীর উপরে বুদ্ধমূর্তি। মনে হইল, খালি জায়গাটীতেও সাধারণ অন্য ভিক্ষুদের রাত্রে শুইবার ব্যবস্থা হয়। কতকগুলি আলমারীতে চামড়ায় বাঁধা বই—বোধ হয় বর্মী অক্ষরে পালি ত্রিপিটক ও অন্য পালি ও বর্মী বই,—এবং বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা কতকগুলি তালপাতার পুঁথি আছে। ভিক্ষুদের কাঠের দেওয়াল দেওয়া কামরাগুলিতে, দেখিলাম—থাকিবার ব্যবস্থা ভালই। কিছু-কিছু সৌখীনত্বের জিনিস আছে—লোহার স্প্রিং-যুক্ত খাট, তদুপরি পরিষ্কার বিছানা, নেটের মশারিও আছে। এই কামরাগুলি ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য হইলে, বুঝিতে পারা যায় যে ভিক্ষুদের খাটের উপরে শুইবার সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে তাহা পালিত হয় না।

এই বাড়ীটীতে তখন জনমানব ছিল না। আমরা দেখিয়া শুনিয়া নামিয়া আসিলাম। পরে, রান্নাবাড়ী ও ভোজনাগারের দিকে চলিলাম। ইতিমধ্যে কুতূহলী ভিক্ষু ও শ্রামণের দুই-একজন আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। শান্তি-বাবু বলিলেন, যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমরা বিহারের প্রধান স্থবির বা আচার্য্য বা মহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

তাহারা বিশেষ ভদ্রতা সহকারে বলিল, তিনি এইমাত্র সেবায় বসিতেছেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তাঁহার অনুমতি লইয়া আসায়, আমরাও ভোজন-স্থানে গেলাম। এই অংশটী সেকেলে ধরণের একটী কাঠের পাটাতনের মেঝেওয়ালা অনুচ্চ দোতালা বর্মী বাড়ী—নীচের তলায় অর্থাৎ মাটীর উপরে কেহই থাকে না। কাষায়-পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক সৌম্যদর্শন একজন আধা-বয়সী ভিক্ষু বসিয়া আছেন, সামনে ছোট চৌকী পাতা, ধোঁয়া উড়িতেছে এমন কি একটা তপ্ত খাদ্যদ্রব্য চীনামাটীর বাটীতে চৌকীর উপরে রহিয়াছে, আর কতকগুলি চীনামাটীর রেকাব ও বাটী আশেপাশে সাজানো রহিয়াছে। শুঁটকী মাছের একটা উগ্র গন্ধে সমস্ত স্থানটী ভরিয়া গিয়াছে—বোধ হয় 'নাপ্পি' অর্থাৎ বর্মার সুপরিচিত পচা মাছের চাটনি বা টাকনার গন্ধ। ব্রহ্মদেশে ভিক্ষুদের মাছ-মাংস খাওয়ার কোনও বাধা নাই, গৃহীরা শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দেয় তাহাই ইঁহারা নির্বিকার-চিত্তে গ্রহণ করেন। এখন ভিক্ষুদের মধ্যে মাছ-মাংস না খাওয়া অবশ্য-পালিতব্য নিয়ম নহে, ঐচ্ছিক কৃচ্ছ্রতা। কাছেই অন্য খাদ্যদ্রব্য, জলের কলসী, কাঠের গেলাস, মাছি তাড়াইবার পাখা—এই সব লইয়া চারি-পাঁচজন অন্য ভিক্ষু গুরুর সেবক রূপে দণ্ডায়মান, তদ্ভিন্ন সাদা-পোশাক-পরা দুই-একজন প্রাচীন বর্মী গৃহস্থ, ধর্মগুরুর আহার-লীলা দেখিবার জন্য হাঁটু পাতিয়া বসিয়া। আমরা আসিতেই আচার্য্য সৌজন্যপূর্ণ ভাবে হাসিয়া আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিলেন; অমনি দুইটী ছোট-ছোট চাটাইয়ের আসন একটী ছোকরা ভিক্ষু আমাদের জন্য পাতিয়া দিল, আমরা বসিলাম। আচার্য্য সস্মিত উৎসুকনেত্রে আমাদের দিকে তাকাইলেন। শান্তি-বাবু বর্মীতে নিজের পরিচয় দিলেন, আমার পরিচয় দিলেন। শান্তি-বাবু সমগ্র বর্মার ভারতীয়-মহলে বিশেষ পরিচিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় ব্যক্তি; এবং ঐ অঞ্চলে বর্মী ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার নাম জানে—

চ্যঙের আচার্য্যও তাঁহার নাম জানিতেন, তিনিও বলিলেন যে "চৌধুরী মহাশয় বলিয়া তাঁহার নাম শুনিয়াছেন; তবে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই।" আমার জন্য দোভাষীর কাজ শান্তিবাবুই করিলেন। আমি বলিলাম—"আপনাদের দেশে আমি বেড়াইতে আসিয়াছি, আপনাদের দেশকে দেখিতে ও বুঝিতে চাহি; আপনাদের দেশের সম্বন্ধে ইতিহাস ও অন্য বই যাহা পড়িয়াছি, সেগুলি হইতে ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ও ব্রহ্মদেশের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু তাহার উৎস যে আপনাদের এই চ্যঙ্‌গুলি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনারা একটী সমগ্র জাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আপনারা জাতির নমস্য, সকলের নমস্য।" এই ধরণের কথায়, বর্মার ইতিহাসে ও বর্মী জাতির সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্থান সম্বন্ধে একটু প্রশস্তি করিলাম—শান্তি-বাবু অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। আচার্য্য আর অন্য ভিক্ষুরা সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আচার্য্য সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক; বৌদ্ধধর্ম আমাদের জীবনকে যে কতটা উন্নত করিয়াছে তাহা আমরা বুঝি। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, যথাশক্তি আমাদের 'ফয়া' বা প্রভু বুদ্ধের অনুশাসন পালন করিতে চেষ্টা করি,—আমাদের দৌর্বল্য দেখ, কিন্তু শক্তি আমরা পাই সংঘ-হিসাবে ধর্মের নিকট হইতে; আর এই ধর্ম হইতেছে বুদ্ধের উপদিষ্ট।' আর এই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—'বুড়া, ডামা, থিঙ্গা'—এই তিনটীই তো আসিয়াছে আপনাদের দেশ হইতে। ভারতবর্ষের গৌরবের প্রতিচ্ছায়া হইতেছে ব্রহ্মের গৌরব—একথা আপনারাও ভুলিয়া গিয়াছেন, আমরাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি।" আমি বলিলাম—"ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের একমাত্র সংযোগ-সূত্র হইতেছেন আপনারা—বৌদ্ধ ধর্মকে এবং আপনাদের অবলম্বন করিয়া এই দুইটী দেশের মধ্যে আবার মৈত্রীর বন্ধন ঘটিতে পারে। এই বন্ধন দৃঢ় করা যেমন ভারতবর্ষে

পালিশাস্ত্র ও ব্রহ্মের বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রহ্মের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা এক দিকে হইতে পারে, অন্য দিকে আমার আত্মীয় শান্তি-বাবুর মত ভারতীয়দের চেষ্টায় ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদের ও ভারতীয় হিন্দুদের সম্প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে।" ব্রহ্মে উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের এ বিষয়ে অবহিত এবং চেষ্টিত না হওয়ায় যে তাঁহাদের ত্রুটী হইয়াছে, শান্তি-বাবু নিজেও তাহা স্বীকার করিয়া বিহারের আচার্য্যকে বলিলেন।

এইরূপ শিষ্টালাপ উভয় পক্ষেই বেশ লাগিতেছিল—কিন্তু ওদিকে উঁহার খাবার যে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আমরা মিনিট পনর-কুড়ি এইরূপ আলাপ করিয়া বিদায় লইলাম। আচার্য্য স্মিতমুখে বসিয়া-বসিয়া বিদায়-অভিবাদন জানাইলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে আসিয়া খানিকটা পথ আমাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

প্যিন্‌মানা শহরের আর একটী বিহারে ঐ দিনই শান্তি-বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। ঐ বিহারটীর নাম Ko Gan Zayat Kyaung 'কো-গান-জ়য়াৎ-চ্যঙ্‌'। এটী পূর্ব-বর্ণিত 'কান-উ চাঙ্‌' অপেক্ষা সমৃদ্ধ। এখানে এ অঞ্চলের বর্মীদের সকলেরই বিশেষ ভক্তিভাজন একজন বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ভিক্ষু থাকেন। প্যিনমানা একটু পাহাড়ে জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত; শহরে একটী অরণ্য-বিভাগীয় বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালা আছে, এই চ্যঙটী তাহার কাছেই, একটু টিলার মত উচ্চ স্থানে। এই চ্যঙে আমরা যখন গেলাম, তখন বেলা প্রায় বারোটা। শান্তি-বাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন ভিক্ষুরা তাঁহাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিতেছেন, একটু পরেই তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন। আমরা তখন চ্যঙ-এর হাতায় ইতস্ততঃ একটু ঘুরিয়া দেখিলাম। বাগানের মত অনেকটা জায়গার মধ্যে চ্যঙ-এর ঘর-বাড়ীগুলি। কতকগুলি স্থান, আমাদের আটচালার মত—কতকগুলি থামের উপরে কাঠে তৈয়ারী

বর্মী কোঠা মাত্র। এইরকম একটী বাড়ীতে দেখি, অনেকগুলি বর্মী মেয়ে-পুরুষ বসিয়াছে। সকলেই পরিষ্কার এবং সুন্দর কাপড় পরা, মেয়েদের মুখে 'তানাখা'র গুঁড়া মাখা, মাথায় ফুল গোঁজা—যেন উৎসব বা নিমন্ত্রণের সভায় সকলে উপস্থিত। শুনিলাম, ইহারা চ্যঙ্-এর আচার্য্যের অনুরাগী ভক্ত, তাঁহার দর্শনলাভের জন্য, তাঁহার কাছ হইতে দুইটী কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছে—মাধ্যাহ্নিক আহার এই মঠেই সারিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে,—খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেই আনিয়াছে—ভিক্ষুদের জন্য ও নিজেদের জন্য। এই বিহারটীতে লোকজন এবং ব্যস্ততা একটু বেশী বলিয়া মনে হইল।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রধান ভিক্ষুর কাছে লইয়া গেল। দ্বিতল একটী কুঠার মধ্যস্থ এক ঘরে তিনি তখন ছিলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে দোতলায় উঠিলাম—এখানকার ব্যবস্থাও পূর্ব্বের কান্-উ-চ্যঙ-এর মত, তবে এখানে অতটা আন্‌কোরা নূতন নূতন ভাব নাই—মনে হইল, এই বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া লোকেরা দস্তুর-মত বসবাস করিতেছে। সেই বুদ্ধমূর্ত্তি, বইয়ের আলমারী, টেবিল-চেয়ার, মাদুর বিছানা-পত্র, একটী হল-ঘরের এখানে-ওখানে রাখা। দেওয়ালে রকমারি ছবি—বর্মী ঢঙ্গে আঁকা; বুদ্ধের জীবনী অবলম্বন করিয়া আঁকা ছবির রঙ্গীন লিথোগ্রাফ ও তেরঙ্গা হাফটোন, রকমারি ক্যালেণ্ডার, মন্দিরের ফোটো, ভিক্ষুদের গ্রুপ-ফোটো। এখানে-ওখানে জাপানে-তৈয়ারী লোহার উপরে এনামেল করা, আমাদের পানের বড় ডাবর অথবা পিতলের বোকনোর আকারের পিকদানী—ভিক্ষুরা আর তাঁদের ভক্তেরা যে খুব পান খাইতে ও পানের পিচ্ ফেলিতে অভ্যস্ত তাহার প্রমাণ যথেষ্ট বিদ্যমান। এই জাপানী এনামেলের পিক্‌দানীর রেওয়াজ বর্মায় খুব বেশী দেখিয়াছি—এগুলি চীনা-মাটির পাত্রের অনুকারী, গায়ে রকমারি চীনা ধাঁজের রঙ্গীন ফুল-পাতা নদী-

পাহাড়ের নক্‌শা। দুইটী দ্বার অতিক্রম করিয়া, আচার্য্য-মহাশয় যে ঘরে ছিলেন আমরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ছোট একটী ঘর—দেওয়ালে ছবি আর ক্যালেণ্ডার টাঙ্গানো, বইয়ের আলমারী, একটী খাটের উপরে বিছানা, দুই-চারিখানি জল-চৌকীর মত কাঠের আসন। মেঝের উপর চাটাই পাতা। একটী দরওয়াজার সামনেই এক কাঠের বারান্দা বা রেলিং-দেওয়া পথ—ওদিকে বাড়ীর অন্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। একখানি মাদুরের উপর একটী কাষায় বস্ত্রে আবৃত বালিশে হেলান দিয়া, আচার্য্য মহাশয় অর্দ্ধ-শয়ান। দর্শনীয় আকৃতি—venerable অর্থাৎ শ্রদ্ধোৎপাদক বলিলে যে ভাবটী মনে হয়, সেই ভাবের উপযোগী মূর্তি, মুণ্ডিত মস্তক, শ্মশ্রুগুম্ফহীন, প্রশান্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক মুখমণ্ডল—তাহাতে বয়সের রেখাপাত আসিয়া যাওয়ায় একটা গভীর চিন্তাশীলতার ভাব আনিয়া দিয়াছে। সর্ব্বোপরি আমাদের আকর্ষণ করিল, মুখের মধ্যে একটা শান্তি ও চিত্তপ্রসন্নতার ভাব। দেখিয়াই মনে শ্রদ্ধা হয়, প্রণাম করিতে ইচ্ছা করে।

আচার্য্য মহাশয় আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমরা চাটাইয়ের উপরে বসিলাম। বর্ম্মীদের পক্ষে দীর্ঘকায়, খুব লম্বা আর সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ, মাথায় লাল ও সবুজ রেশমের রুমাল, গায়ে সাদা জামার উপর গোলাপী রেশমের চাদর পরা এক সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোক পিতলের ছোট হামানদিস্তা ও ডাঁটী লইয়া পান ছেঁচিতেছেন। আচার্য্য মহাশয়ের সামনে একটী পিক্‌দানী। মাধ্যাহ্নিকের পরে পান খাইয়া মুখশুদ্ধি করিয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে পিক্‌দানীর ব্যবহারও চলিল। ঘরে আর দুই-তিন জন ভিক্ষু বসিয়া রহিলেন। শান্তি-বাবু যথারীতি নিজের ও আমার পরিচয় দিলেন, এবং আমার দো-ভাষীর কাজ করিলেন। তিনি আচার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

আচার্য আধ-শোয়া অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন—"দেহের মতে কুশল। কিন্তু ও-কুশলে কি আসে যায়? আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি যাহাতে যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই যে আমি বসিয়া রহিয়াছি,—আমার হাত-পা-মাথা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, আমি আছি, এই বোধ যাহাতে যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ দৃষ্টি ও অনুভব আমাদের হওয়া চাই, যাহাতে আমার এই যে হাত, ইহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে বা ইহাকে কাটিয়া লইলেও আমার কিছুই আসিল না বা গেল না—এইরূপ উপলব্ধি আমাদের হওয়া চাই।" তিনি এই কথাগুলি এমনই বিশ্বাসপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের মনে হইল তাঁহার নিজের মধ্যে এই উপলব্ধি যেন হইয়াছে। বহু পূর্বে পুরীর গোবর্ধন-মঠে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল (ইনি উড়িষ্যার একটী সামন্তরাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিরিশ বৎসর বয়সে ঘর-সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন)—তাঁহারও এইরূপ সৌম্য প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল দেখিয়াছিলাম, তাঁহারও মুখে এই ভাবের কথা এইরূপই উপলব্ধি-জাত দৃঢ়তার সহিত শুনিয়াছিলাম—তাঁহার কথা আমার তখনই মনে হইল। হীনযান বৌদ্ধ, অদ্বৈত বৈদান্তিক, এবং ভক্ত বৈষ্ণব, অথবা সূফী বা খ্রীষ্টান—ইঁহাদের সকলের শেষ কথা কি একই নয়?

আমরা যে এইরূপ তত্ত্বালোচনার মধ্যে প্রথমেই অবতীর্ণ হইব, এই ধারণা আমাদের ছিল না। আর এ বিষয়ে আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই, শ্রোতা হওয়াই আমার একমাত্র পথ। সংঘাচার্য কিয়ৎকাল ধরিয়া এইরূপ বলিয়া গেলেন—সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া শান্তি-বাবু আমায় শুনাইতে লাগিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, হীনযান বৌদ্ধ মতে যে নির্বাণকে চরম বস্তু বা পরমার্থ বলিয়া উল্লেখ করে, সেই নির্বাণ কোনও সৎ বা সত্য বস্তু, ব্রহ্মবাদের বা পরব্রহ্মের সত্তায় বিলীন হওয়ার মত অবস্থা বলিয়া তাঁহাকে

মনে হয় কি না, সে কথা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। সেই জন্য আমি শান্তি-বাবুর মারফৎ প্রশ্ন ফাঁদিলাম—"সংসারকে তো পালি গ্রন্থে 'অনিচ্চ' 'দুক্‌খ' ও 'অনত্ত' (অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম) বলিয়াছে ; 'অনত্ত' বা অনাত্ম—এই শব্দের তাৎপর্য্য কি ? আত্মা জিনিসটী কি—কিছু positive অর্থাৎ সদ্‌বস্তু, না negative বা অসৎ ?" এখন, পালি শব্দগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিলে, সাধারণ বর্মী ভিক্ষুদের বোধগম্য হইবে না—বর্মী ভিক্ষুরা পালির মূল উচ্চারণকে বর্মী ভাষার উচ্চারণ-মোতাবেক বদলাইয়া পাঠ করিতে অভ্যস্ত। 'অনিচ্চ', 'দুক্‌খ,' 'অনত্ত'—এই তিনটী পালি শব্দ আচার্য্যের পক্ষে সহজে ধরিবার জন্য আমি শান্তিবাবুকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম—" 'অনিত্য বা অনিচ্চ' না বলিয়া, বলুন 'আনেইক্‌সা' (anicca স্থলে aneiksa), 'দুঃখ' বা 'দুক্‌খ' স্থলে বলুন 'দোক্‌কা,' আর 'অনাত্ম' বা 'অনত্ত' স্থলে বলুন 'আনাত্তা'।" আমাদের এই আলাপটুকু শুনিয়া, পালি কথাগুলি ধরিতে পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলেন —শান্তি-বাবু তখন বলিলেন, "পালি শব্দগুলির বর্মী উচ্চারণ লইয়া কথা হইতেছে।" আমি বলিলাম—"আনেইক্‌সা, দোক্‌কা, আনাত্তা—অনিচ্চ, দুক্‌খ, অনত্ত।" এখন আমার জিজ্ঞাস্য, 'অনত্ত' বা 'অনাত্ম' ভাবটী আচার্য্য মহাশয়ের মত বা উপলব্ধি অনুসারে সত্যসত্যই কি,—সে দিক্ হইতে আলোচনা কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে অন্যদিকে চালিত হইল। পালি উচ্চারণ আর বর্মী উচ্চারণ—এই দিকে আলোচনার গতি ফিরিল। "চোরের মন বোঁচকার দিকে"—আর "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—নহিলে জগন্নাথ-দর্শন করিতে গিয়া লাউ-মাচা দেখিয়া লোকে ফিরিয়া আসে ? আমার অনাত্ম-ঘটিত জিজ্ঞাসা প্রকাশ করিয়া বলাই হইল না ;—উচ্চারণ-তত্ত্বের দিকে আলাপ-আলোচনা চলিয়া যাওয়ায় আমিও আপত্তি করিলাম না,—আমি বলিলাম, "আপনারা বর্মা-দেশে পালির উচ্চারণ সংশোধন

করিবার চেষ্টা করেন না কেন? দন্ত্য 'স' কে 'থ'-রূপে বা 'দ' রূপে, 'ব'কে 'য়'-রূপে, আর অন্যান্য স্বর ও ব্যঞ্জনকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে উচ্চারণ করেন, ইহাতে বুদ্ধবাণী মূল ভাষায় থাকিয়াও বিকৃত হয়, বর্মার বাহিরের পালি-ভাষাভিজ্ঞদের বুঝিবারও কষ্ট হয়—'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা-সম্বুদ্ধস্স'কে কেন আপনার 'নামো টাৎথা বাগাউআডো আয়াহাডো থান্‌মাথাম্‌বুড্ডাৎথা' পড়িবেন?" তখন আচার্য্য একটু উৎসাহ করিয়া অর্ধশয়ান অবস্থা হইতে উঠিয়া হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "আমরা ঠিক-মত উচ্চারণ করি না—করিতে পারি না যে তাহা নহে, কিন্তু পালির মূল ধ্বনির একটী আমাদের মুখে সহজেই আর একটীতে পরিবর্তিত হয়—আমাদের-কাছে-সহজ এই পরিবর্তনকে আমরা মানিয়া লইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতকে তুলিয়া উবুড় করিয়া, খিলানের আকার করিয়া ধরিয়া, তদ্দ্বারা মুখের অভ্যন্তরের উপরের চোয়াল নির্দেশ করিলেন, অধোমুখে স্থিত ঐ হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলি যেন হইল মুখের মধ্যে স্থিত দাঁত; এবং এই উলটানো বাঁ হাতের চেটোর নীচেই চিৎ করিয়া ডান হাতের চেটো রাখিলেন—ডান হাতের চেটো হইল যেন নীচের চোয়াল, এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে সংযুক্ত করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া ও উঁচুতে নীচুতে চালিত করিয়া, তদ্দ্বারা জীভের কাজ করাইলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—মূর্ধন্য বর্গ কি ভাবে উচ্চারিত হয়, আর কেমন করিয়া বর্মীতে সেগুলি দন্ত্য বর্গের সামিল হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া দন্ত্য 'স' স্থানে দন্ত্য 'থ' দাঁড়াইয়াছে, কেমন করিয়া দন্ত্যমূলীয় 'র', তালব্য 'য়' স্থানে আসিয়াছে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। শান্তি-বাবুর অনুবাদ, তাঁহার উচ্চারণ-তত্ত্ব বিষয়ক দ্রুত বক্তৃতার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না—আচার্য্য বর্মীতে অনর্গল বলিয়া চলিলেন, আমি বিশেষ প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

তাঁহার হাতের সাহায্যে এই উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-ঘটিত ব্যাখ্যান শুনিতে ও দেখিতে লাগিলাম। চকিতের ন্যায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির একটী practical বা প্রযোজনার দিক যেন খুলিয়া গেল ;—তালপাতার পুঁথি লইয়া গুরু-শিষ্য বসিয়াছেন, ব্ল্যাকবোর্ড নাই, ছবি আঁকিয়া সব জিনিস বুঝাইবার রেওয়াজও আসে নাই—প্রাচীন ভারতের গুরুরা বুঝি এই ভাবেই সহজে হাতের চেটো আর আঙ্গুলের সাহায্যে মুখের মধ্যে জীভ আর কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতির ক্রিয়া দেখাইয়া উচ্চারণ বুঝাইতেন। মনে হইল, নিশ্চয়ই গুরুপরম্পরায় প্রাচীন ভারত হইতেই শিক্ষার অর্থাৎ উচ্চারণ-তত্ত্বের অধ্যাপনায় এই 'হাতে-কলমে' বুঝাইয়া দিবার রীতি বর্মায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে।

এইরূপে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী বিষয়ে ইঁহাদের অধ্যাপনা-রীতি দেখিলাম। আচার্য্য মহাশয়ের কথায় বুঝিলাম, তিনি শিক্ষা বা উচ্চারণ-পর্য্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া পালি ব্যাকরণের খুঁটিনাটি সব বেশ জানেন। পালি বিদ্যায় প্রাচীন কালের অগাধ পাণ্ডিত্য এখনও বর্মার ভিক্ষুদের মধ্য হইতে লোপ পায় নাই। সংস্কৃতের সঙ্গেও তিনি কিছু-কিছু পরিচিত, 'শ, ষ, স'-র কথাও জানেন। আমি মাণ্ডালেতে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ বিহার হইতে বর্মী ভিক্ষু মাণ্ডালেতে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী 'পোনা' বা ব্রাহ্মণদের মারফৎ বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত ব্যাকরণ আনাইতেছেন, উচ্চ কক্ষায় পালি শিক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পরে বর্মী ভিক্ষুদের অনেকেই সাবেক পদ্ধতিমত সংস্কৃত ধরেন।

তারপর অন্য কথা উঠিল। বর্মা-প্রবাসী বাঙ্গালীরা যে রেঙ্গুনে সাহিত্য সম্মিলন করিয়াছেন তদুপলক্ষে আমি বর্মায় আসিয়াছি, বর্মী বইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ (বিশেষ করিয়া বর্মী নাটক, কবিতা আর ইতিহাস-গ্রন্থের) আর বাঙ্গালা বইয়ের বর্মী অনুবাদ হওয়া উচিত, এ

বিষয়ে আমি প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও শুনাইলাম। আচার্য্য এ কথায় খুশী হইলেন। তারপর ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগের বিষয় লইয়াও অল্প দুই-চারি কথা হইল। শুনিলাম, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রায় সকলেই ভারত হইতে ব্রহ্মদেশের বিচ্ছেদের বিপক্ষে।

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে আলাপ করিলাম। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, আমরা বিদায় লইয়া উঠিলাম। সেই দীর্ঘগুম্ফ বর্মী ভদ্রলোকটী ও দুই চারিজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে আসিলেন। এই আলাপে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। আমাদের দেশের যাঁহারা বর্মায় যাওয়া-আসা করেন বা বর্মায় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা যদি এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তাহা উভয় জাতির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ বর্মার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে এই প্রকার ভিক্ষুদের মধ্যে এখনও বর্মী জাতির চিত্তের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষক এই সকল ভিক্ষুর সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমাদের চিত্তে অতি উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইব, এবং বর্মার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষকে—অর্থাৎ নিজদেরও—জানিতে শিখিব ॥

[আশ্বিন ১৩৪৭]

হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে ?

কোন মুসলমান বন্ধু নিম্নলিখিত পাঁচটী প্রশ্ন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বার-এট্-ল, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নির্মলবাবু ঐ-প্রশ্নগুলি আমাকে পাঠাইয়া দিয়া ঐগুলির উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। মানুষের জীবনযাত্রার সকল দিক্ ও সকল স্তর ব্যাপিয়া হিন্দুত্বের পরিধি, এরূপ একটী ব্যাপক ধর্মের সংজ্ঞা সংক্ষেপে নির্ণয় করা যে কত কঠিন, পণ্ডিতেরা তাহা জানেন। আমি হিন্দুর চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীতে দৃঢ় বিশ্বাসী, এবং যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি উহাকে নিজ জীবনের কার্য্যকর করিবার প্রয়াসী। এই মত ও পথের অনুযায়ী রূপে, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে আমি হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা-নির্ণয় কার্য্যে চেষ্টিত হইতেছি।

প্রথম প্রশ্ন : (ক) হিন্দুত্ব কাহাকে বলে ? (খ) হিন্দুত্ব (Hinduism) ও হিন্দুধর্ম (Hindu Religion) কি এক ? যদি না হয়, তবে কোন্-কোন্ বিষয়ে উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে ?

উত্তর :—(ক) যে-সকল ধর্মের মূলনীতি (অথবা যে-সকল ধর্মের অনুগামিগণের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস) একটী বিশেষ বা নির্দিষ্ট ধর্ম-বীজ অথবা সূত্র দ্বারাই প্রকাশিত হয়, হিন্দুত্ব সে প্রকারের ধর্ম নহে। অন্য সকল প্রকারের ধর্মমতকে বাদ দিয়া অথবা অস্বীকার করিয়া, একটী মাত্র মতবাদ লইয়াই ইহা গঠিত নহে, বরং, হিন্দু ধর্মকে বহু ধর্মমতের সঙ্ঘ বা সমবায় বলা যাইতে পারে। এই ধর্ম ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। এই ভারতীয় জনগণ, মনুষ্য-

জাতির বিভিন্ন শাখার সমবায় বা মিলনের ফল। প্রথম-প্রথম এই-সব বিভিন্ন জাতিব মানুষের সভ্যতার পটভূমিকা এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গী উভয়ই পৃথক্ ছিল। বৈদিক যুগ হইতে (এবং উহার পূর্ব হইতেও) আরম্ভ করিয়া, যুগে-যুগে ভারতীয় ঋষিগণ, জিনগণ ও বুদ্ধগণ, এবং আচার্য্য, সিদ্ধ ও ভক্তগণ, এই হিন্দুধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা, বর্ণনা এবং স্বরূপ-নির্ণয় করিযাছেন, অথবা কাব্যময় কল্পনার রঙ্গে রঞ্জিত করিযা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই-সমস্ত ঋষি, ও জ্ঞানী সাধু ও ভাবুক, ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশকে ও এই-সব প্রকাশের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলিকে সর্বদা সহানুভূতিব দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

হিন্দুধর্মেব কয়েকটী বিশেষত্ব এই:—

[১] যে পবা সত্তাকে (চবম বা শাশ্বত সত্যকে) মানুষ আত্মোৎকর্ষ দ্বাবা, জ্ঞান দ্বাবা, ও সাধনালব্ধ আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা, অথবা ভগবানের প্রসাদ বা কৃপা দ্বারা লাভ করিতে পারে, মানুষ ইহজীবনে এবং পরজীবনে যে সত্তাব একটী অংশমাত্র, যে সত্তা আমাদের জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অথচ ওতপ্রোতভাবে উহাব মধ্যে পবিব্যাপ্ত, হিন্দুধর্ম সেই পরা সত্তায় বিশ্বাস কবে, এবং যুক্তি দ্বারা, আস্থা দ্বারা ও কর্ম দ্বারা উহাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবার চেষ্টা করে।

[২] জীবনের সকল প্রকার দুঃখকে হিন্দুধর্ম স্বীকার করে, এবং এই-সমস্ত দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা করে।

[৩] কল্পকল্পান্তর হইতে অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। হিন্দুধর্ম মানুষের জীবনযাত্রার এবং সেই অনন্ত বিশ্বের কোনও দিক্‌কেই উপেক্ষা করে না। মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতিব অংশমাত্র, হিন্দুধর্ম মানুষকে বিশ্ব-প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ মনে করে না। হিন্দুধর্মেব মতে, মানুষ এবং প্রাকৃতিক জগৎ সেই এক পবমাত্মা বা শক্তি অথবা ঋতের প্রকাশ মাত্র।

[৪] হিন্দুধর্ম একটীমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কিংবা মতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—সে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই স্বীকৃত হউন অথবা প্রেরিত পুরুষ বলিয়াই স্বীকৃত হউন, যদিও হিন্দুধর্ম সকল মহাপুরুষকেই শ্রদ্ধা করে। হিন্দুধর্ম স্বীকার করে যে, বিশ্বের মধ্যে নিহিত ও বিশ্বের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান শাশ্বত সত্তা বা সত্য বহু প্রকারে নিজেকে প্রকাশিত করে, এবং ভিন্ন-ভিন্ন পন্থাদ্বারা সেই একই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইহেতু, হিন্দুধর্ম একথা জোর করিয়া বলে না যে, প্রত্যেক মানুষকেই একটী বিশেষ মত বা creed অর্থাৎ ধর্ম-বীজ গ্রহণ করিতেই হইবে। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ নিজ-নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা পায়, আন্তরিকতা ও উদারতার সহিত তাহারই অনুসরণ করিলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

প্রায় সকল হিন্দুই (ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অনুগামিগণ, এবং অন্যেরাও ইহার মধ্যে পড়ে) কর্ম-বাদ ও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রত্যেককেই যে ঐ বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কোন অবশ্য বিধান নাই।

(খ) যদি religion এই ইংরেজী শব্দের মূল লাতীন ভাষা অনুসারে মৌলিক অর্থ ধরা হয়, অর্থাৎ 'চিন্তা বা মনন করা (মনুষ্যজীবন এবং ভগবান্ সম্বন্ধে চিন্তাকরা)' এই অর্থ ধরা হয়, তবে 'হিন্দুত্ব' (Hinduism) অর্থাৎ হিন্দুর বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং 'হিন্দুধর্ম' (Hindu Religion) একই। হিন্দুদিগের ধরণে এই প্রশ্নের উত্তর আরও ভাল রূপে দেওয়া যায়। ধর্ম বলিতে দুইটী বিষয় বুঝায়—[১] বিচার, অথবা দর্শন-শাস্ত্র; [২] আচার অর্থাৎ জীবন-রীতি। দ্বিতীয়টী প্রথমটীর উপরই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন আমরা সচেতন ভাবে কাজ করি। মানুষ ইহজীবন ও পরজীবন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, তদনুসারে সে কাজ করে। হিন্দুত্বের ব্যবহারিক দিক্‌টাকে 'ধর্ম' বলা হয়—'ধর্ম' অর্থে, 'যাহা ধারণ করে', অর্থাৎ

জীবনযাত্রার পদ্ধতি বা নিয়ম। 'ধর্ম'কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'নিত্যধর্ম' অর্থাৎ সনাতন নৈতিক নিয়মগুলি (যথা,—সত্য, অস্তেয়, অহিংসা), এবং (২) 'লৌকিক ধর্ম' অর্থাৎ জীবনযাত্রার গৌণ নিয়মগুলি, সেগুলি ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পাত্র অর্থাৎ ব্যক্তি-সমষ্টি ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে (যথা—পূজাপার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, উপবাস, বিশেষ খাদ্য বর্জন ইত্যাদি)। হিন্দুর 'দর্শন' (দর্শন = দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র) এবং হিন্দুর 'ধর্ম' (ধর্ম = যাহা ধারণ করে, অর্থাৎ সমাজ- ও ধর্ম-বিষয়ক আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ)—এই দুইটী হিন্দুত্বের দুই দিক। অহিংসা, করুণা ও মৈত্রী মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক ভাবে দেখিতে গেলে, মানুষের জীবনে তিনটী ঋণ পরিশোধ করিতে হয়—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। দেবতা বা ঈশ্বরের পূজা ও সেবা দ্বারা দেবঋণ, বিবাহ ও গৃহস্থাশ্রম দ্বারা পিতৃপুরুষ অর্থাৎ পূর্ব-পুরুষগণের ঋণ, এবং জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানবিস্তার দ্বারা ঋষিঋণ শোধ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। মোক্ষ-লাভের (অর্থাৎ সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের) ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, সাংসারিক ব্যাপার বা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকা, এবং বৈরাগ্য, এই দুই উপায় অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের জীবনের চারিটী পুরুষার্থ বা লক্ষ্য (উদ্দেশ্য)—ধর্ম (পুণ্যময় জীবন), অর্থ ও কাম (ধর্মানুমোদিত অভীষ্ট-সিদ্ধি, ও আনন্দ-উপভোগ) এবং মোক্ষ (সংসার বা জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তি)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা (বা লক্ষণনির্দেশ) কোন্ কোন্ পুস্তকে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থে আছে ?

উত্তর :—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম কোনও একটীমাত্র মতকে বা একটীমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে না। সুতরাং কোনও একখানিমাত্র পুস্তকে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বা

অনুমোদিত সমস্ত সত্য, আদ্যন্ত সমগ্র চিন্তাধারা, লিপিবদ্ধ নাই। উপনিষৎসমেত চতুর্বেদ, রামায়ণ, ভগবদ্‌-গীতাসমেত মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি এবং অন্যান্য গ্রন্থে হিন্দুর চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার প্রধান বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত, বহুবিধ দার্শনিক পুস্তকে (মূলগ্রন্থে ও টীকায়), মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সাধুসন্তগণের ভজনগানে, এবং দার্শনিক পণ্ডিতদের তত্ত্বালোচনায়, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন-প্রকারের ধার্মিক ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিবার জন্য এক বা একধিক Scripture বা ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

[১] ১৩খানি প্রধান উপনিষদ্‌ (বিশেষতঃ ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক এবং শ্বেতাশ্বতর), [২] ভগবদ্‌গীতা (হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী), [৩] শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্র—অশ্বঘোষ-রচিত মহাযান-মতানুযায়ী বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত, কেবল চীন ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ বর্তমান। (বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই প্রকারভেদ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক ইংরেজ গ্রন্থকারের ভাষায়, বৌদ্ধধর্ম হইতেছে 'বিদেশে প্রেরণ করিবার উপযোগী হিন্দুধর্মের রূপান্তর মাত্র।')

আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পড়া যাইতে পারে :—

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী। [২] স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থাবলী, [৩] স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌ প্রণীত—Indian Philosophy (2 vols.) এবং Hindu View of Life, [৪] Sanatan Dharma: an advanced Text-book of Hindu Religion and Ethics (2nd edition),

মাদ্রাজের থিওসোফিকাল সোসাইটি হইতে পুনঃপ্রকাশিত ; [৫] Sir Charles Eliot-প্রণীত Hinduism and Buddhism (3 vols.) ; [৬] J. Estlin Carpenter প্রণীত Theism in Medieval India ; [৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'সাধনা' ; [৮] Ananda Kentish Coomaraswamy প্রণীত The Dance of Siva ; [৯] বেলুড়, রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত The Cultural Heritage of India (3 vols.)।

তৃতীয় প্রশ্ন—যে ব্যক্তি কোরান, বাইবেল, অথবা বৌদ্ধ পঞ্চশীলে বিশ্বাস করে এবং তদনুরূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, ইচ্ছা করিলে সে কি হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ?

উত্তর :—নিশ্চয়ই, কিন্তু কয়েকটী শর্ত আছে, অর্থাৎ, যদি সেই ব্যক্তি হিন্দুদর্শনের মতগুলিকে (যথা, এক পরমেশ্বর বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজা পাপ নহে, বরং ঈশ্বরের সাধনার একটা পথ বা স্তর মাত্র, যাহা বহু লোকের পক্ষে আবশ্যক —ইত্যাদি মতকে) মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত এবং পাপপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা না করেন ; এবং যতদিন হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস করিবেন, তিনি ততদিন হিন্দু সমাজে যাহা বহুকাল ধরিয়া সদাচার বলিয়া প্রচলিত এরূপ অনুষ্ঠান ও আচরণের (যথা—গোমাংস-ভক্ষণ হইতে বিরতির) বিরোধী না হন, এবং ছলে অথবা বলে অপরকে নিজের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণায় ও নিজের আচরণে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা যদি না করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন—পৃথিবীর যে কোন দেশেই কেহ জন্মগ্রহণ করুক না কেন, কি কি গুণ বা লক্ষণ থাকিলে তাহাকে হিন্দু বলিয়া জানা যাইবে ?

উত্তর :—বিশ্বমানবের এবং মানুষের মনের বহুবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ বিকাশকে ভাঙ্গিযা চুরিয়া, সমগ্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে একটী-মাত্র বাঁধা-ধবা মতে বা বিশ্বাসে পবিণত করা হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য নহে, হিন্দুধর্ম একত্বের ভিত্তিতে বহুত্বকে স্বীকার করে, এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বা একচ্ছত্রত্ব কামনা করে না। যে-কোনও স্বভাবজ (স্বাভাবিক প্রণালীতে উদ্ভূত) ধর্ম, যাহা নিজেকে পবমেশ্বরেব বিশেষ অনুগৃহীত পথ বা মত বলিয়া অন্য ধর্মেব প্রতি অসহিষ্ণু ভাব পোষণ করে না (যথা, প্রাচীন বাবিলন, মিসব, গ্রীস, ইতালীব ধর্ম, এবং প্রাচীন টিউটনিক, কেল্তিক ও শ্লাব জাতিব ধর্ম, প্রাচীন পারস্তেব ধর্ম, চীনেব 'তাও' ও কনফুশীয় ধর্ম, জাপানের শিন্তো ধর্ম; আফ্রিকা, ওশেয়ানিয়া, এবং কোলম্বস কর্তৃক আবিষ্কারেব পূর্বেকাব আমেবিকার ধর্ম), তাহারই সহিত হিন্দুধর্মেব ঐক্য আছে। হিন্দুধর্ম ভাবতে উদ্ভূত স্বভাবজ ধর্ম। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্মেব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, এবং নিজেকে হিন্দু বলিযা অভিহিত করিতে চাহেন, তবে তাঁগার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা উচিত :—

[১] সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার উদার সহানুভূতি থাকা চাই, এবং তাঁহাকে এই মত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতিই সত্য, এবং নিজ-নিজ দেশ, কাল ও জাতিব সম্পর্কে সেই সমস্ত বিভিন্ন অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী; অধিকন্তু তাঁহাকে ইহাও মানিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম বা আচাব অপবের ন্যায্য অধিকাবে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ উহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করা পাপ। যদি তিনি সকল প্রকাব ধর্মেব সম্মেলনেব অথবা সংমিশ্রণেব সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আস্থা পোষণ কবিতে না পাবেন, তবে একান্ত পক্ষে একটী ধর্মমত বজায রাখিযা অপর-গুলিকে নিশ্চিহ্ন কবার অপেক্ষা ববং সকল ধর্মই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই মত তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

[২] হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ভিন্ন-ভিন্ন ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং অনুভূতি থাকা চাই। ইচ্ছা করিলে, তিনি, নিজের আধ্যাত্মিক রুচি ও আবশ্যকতা অনুসারে, ঐ সকল অভিজ্ঞতার বা ধর্মমতের যে-কোনও একটী গ্রহণ করিয়া উহার অনুসরণ করিতে পারেন।

[৩] প্রথম প্রশ্নের 'ক' চিহ্নিত অংশের উত্তরে যে নিত্যধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহা পালন করার সঙ্গে-সঙ্গে, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন (এবং বিশেষ করিয়া যখন তিনি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে থাকিবেন), ততদিন তাঁহাকে হিন্দুদিগের লৌকিক ধর্মের মুখ্য বিধানগুলিও পালন করিতে হইবে। যেহেতু হিন্দুধর্মের দেশ, কাল ও জাতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ভারতবাসীদিগের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিকাশ, অতএব আশা করা যাইতে পারে, কোন বিদেশী অ-ভারতীয় হিন্দু হইয়া ভারতবর্ষে বাস করিতে চাহিলে, তিনি সঙ্গত সীমার মধ্যে, অর্থাৎ অপর জাতির লোকদের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, ভারতবাসীদিগের মঙ্গলকে নিজের মঙ্গল মনে করিবেন। যিনি হিন্দুদর্শন এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবেন অথচ হিন্দুদিগের দেশের বাহিরে বাস করিবেন, তিনি ভারতের প্রতি citizen's obligations অর্থাৎ নাগরিকোচিত কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য থাকিবেন না, এবং হিন্দুর লৌকিক ধর্ম অনুসরণ করাও তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইবে না।

পঞ্চম প্রশ্ন—কি কি বিশ্বাস ও আচরণ থাকিলে, কোনও ব্যক্তি হিন্দু বলিয়া কথিত হইতে পারিবেন না?

উত্তর :—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ও হিন্দু জীবনে প্রকাশিত হিন্দুর চিন্তাধারার প্রতি

এবং হিন্দু জীবন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব একটী অমার্জনীয় দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

[১] যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডীর বাহিরের লোকেরা ঐশ্বরিক সত্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এবং যাহারা ঐ ধর্মানুযায়ী নহে অথবা উহা গ্রহণ করিবে না, তাহারা ঈশ্বরের চক্ষে পাপী ও নরকগামী, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[২] যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, যাহারা সেই ব্যক্তির নিজের ধর্মের বিধানানুসারে যাহা নিষিদ্ধ ও পাপ বলিয়া বিবেচিত এমন আচার ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে (যথা, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের এবং রোমান কাথলিকদিগের প্রতীকোপাসনা), ঐ-সকল অনুষ্ঠান অপরের ধর্মে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাহারা ভগবানের কাছে পাপী, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[৩] যদি কেহ হিন্দুদিগের মধ্যে বাস করিয়াও হিন্দু জনসাধারণের অনুসৃত সদাচার ও সাধু জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে চিরাগত হিন্দু আদর্শের অনুগামী না হন (যথা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, কোন-কোন খাদ্য পরিহার, এবং পর্ব, উৎসব ইত্যাদি পালন বিষয়ে), যদি তিনি হিন্দুদের মধ্যে বাস করিয়া এবং নিত্যধর্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া, মোটামুটি ভাবে হিন্দু লৌকিক ধর্মের ব্যবস্থার অনুযায়ী না হন, তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

[৪] কোন ও ভারতীয় পুরুষ বা নারীর যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে (বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাস করিবার সময়ে) যে, 'আমি সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, তারপর অন্য কিছু'; হিন্দুধর্ম যাহার একটী প্রধান অঙ্গ সেই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী যদি তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক পটভূমিকা না হয়; তবে তিনি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না।

উপসংহারে আমি অতীব আনন্দের সহিত নিম্নলিখিত উক্তিটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার মতে, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা, এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় চিন্তার মধ্যে বিভিন্নতা থাকিবেই ইহা স্বীকার করা, আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। কোরানে এই মর্মে একটী কথা আছে যে, ঈশ্বর মানবজাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে তাহাদের একটীমাত্র ধর্ম হইত, কিন্তু তিনি মানুষকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি কিরূপে ব্যবহার করে ইহা দেখিতে চাহিলেন। মনে হয়, মানবের চিন্তাধারার বিভিন্নতা সৃষ্টি-পরিকল্পনার অন্তর্গত, এবং অন্যান্য বিষয়ে এই প্রকার বিভিন্নতা প্রকৃতির কার্য্যের অনুরূপ। ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদযুক্ত বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল প্রকৃতিদেবীর বৈচিত্র্য-প্রিয়তার সার্থক দৃষ্টান্ত। আসুন, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, সকল ধর্মেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। এই উদার ভ্রাতৃভাবের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা যেন সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করি, ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই। অতীতকালে ভারতের যে সূফীগণ ও সাধুসন্তগণ প্রেম ও সহানুভূতি দ্বারাই অপরকে জয় করিতেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত নীতিরই অনুসরণ করিতেন, এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ এই উদার ভাবের মধ্যেই সংস্কৃতি-ঘটিত সমস্যার মীমাংসা পাইবে।" (The Cultural Problem : Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No. 1, pp. 24-25)।

ভারতের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজপুরুষ, ভারত-সচিবের ভূতপূর্ব পরামর্শমন্ত্রী এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের বহাবলপুর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি স্যর আব্দুল কাদির উপরিলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রসভার সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যায় অনুরূপ উদার এবং সহানুভূতিপূর্ণ মত

প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলানা আজ্জাদ ভারতের, বিশেষতঃ মুসলমান ভারতের, এবং আরবদেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা ও আদর্শের উত্তরাধিকারী; তিনি ধর্মের গৌণবিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা এবং মুখ্যবিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করেন। ইস্লাম-ধর্মের ধর্মের মুখ্যবিষয়গুলি বা মূল কথা তাঁহার মতে এই:—[১] ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং [২] সৎকার্য্য-সম্পাদন। বাস্তবিক পক্ষে, ঐগুলিই সকল স্বভাবজ ধর্মের মূল বিষয়, এবং সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব বা চিন্তাধারার সহিত ঐগুলির মিল আছে। আমরা ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানেরা, যখন আব্দুলকাদির এবং আবুল কালাম আজ্জাদের মত ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে পারিব, তখন ভারতমাতার সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। এই নেতাদের মত গ্রহণ করিলে আমরা কোনও সঙ্কীর্ণ, পরের প্রতি অসহিষ্ণু, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাতৃত্ব অপেক্ষা, অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং উচ্চতর ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সম্মানীয় স্থান পাইব। অপর পক্ষে, 'যুদ্ধং দেহি'-ভাবশীল, অসহিষ্ণু এবং পরবর্জনশীল ইস্লামের ভাব লইয়া "শিক্ওাহ্" এবং "জওাব-ই-শিক্ওাহ্" নামক উর্দূ কবিতার লেখক পরলোকগত স্যার মুহম্মদ ইক্বালের নেতৃত্ব মানিয়া চলিলে, ঐ সম্মানীয় স্থান আমরা পাইব না। ইক্বাল যে অসহিষ্ণু মনোভাব লইয়া ঐ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই যে, ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবে প্রিয় কোন জাতি বা ধর্ম নাই, ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট মনুষ্যমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নহেন, কিন্তু তিনি সমগ্র মানবজাতির; তিনি ন্যায়বান্ ও সমদর্শী সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিচারক; তিনি, কেবল এক রূপে নয়, পরন্তু বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

[প্রবন্ধটী মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।]